~~Leniót~~

~~3748~~

~~243~~

সূর্য-দীঘল বাড়ী

আবু ইস্‌হাক

নবযুগ প্রকাশনী
১সি সার্কাস মার্কেট প্লেস,
কলিকাতা—১৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল, ১৯৫৫

প্রকাশক ঃ
এ. হক
১সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস,
কলিকাতা—১৭

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

পরিবেশক ঃ
ভারতী লাইব্রেরী
৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
পাকিস্তান এজেণ্ট ঃ
নওরোজ কিতাবিস্তান
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
(পূর্ব পাকিস্তান)

মুদ্রাকর ঃ
হেমন্ত কুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিণ্টার্স,
৪এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

দু'টাকা বারো আনা

বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

এক

আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।

অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্য বড় লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলতখানার জাঁক-জমক, সৌখীন পথচারীর পোশাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোজে। ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ীর চাকায় নিস্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউবা।

যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে; কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শির-দাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ—শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙ্গা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুক্‌ধুকে প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে প্রাণ-সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ ক'রে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট-খাওয়া দেশ আবার টল্‌তে টল্‌তে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।

দুটি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুনও ফিরে আসে। বাইরের ছন্নছাড়া জীবন এতদিন অসহ্য ঠেকেছে তার কাছে। কতদিন সে নিজের গ্রামে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছে, স্বপ্ন দেখেছে। ছায়া-সুনিবিড় একখানি বাড়ী ও একটি খড়ো ঘর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কতদিন। কিন্তু বৃথাই ডেকেছে। তার সে বাড়ী, সে ঘর আর তার নয় এখন। দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে কোথায় গেল বাড়ী আর কোথায় গেল ঘর। বেচে নিঃশেষ করে দিল উদরের জ্বালা মেটাতে।

জয়গুন গ্রামে আসে একটিমাত্র আশা নিয়ে। ছাড়া ভিটে আছে একটা। সে তার আট আনা অংশের মালিক। বাকী আট আনার অংশীদার তার নাবালেগ ভাই-পো শফী। শফীকে নিয়ে শফীর মা-ও আসে। তাদেরও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। শেষে স্থির হয়—এই ছাড়া ভিটেটার ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে দুই ভিটিতে দু'খানা ঘর তুলে আবার তারা সংসার পাত্‌বে।

কিন্তু এটা যে সূর্য-দীঘল বাড়ী!

জয়গুন ও শফীর মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

পূর্ব ও পশ্চিম সূর্যের উদয়াস্তের দিক। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ীর নাম তাই সূর্য-দীর্ঘল বাড়ী। সূর্য-দীঘল বাড়ী গ্রামে কচিৎ দুই-একটা দেখা যায়। কিন্তু তাতে কেউ বসবাস করে না। কারণ গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস—সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়। বংশে বাতি দেয়ার লোক থাকে না। গ্রামের সমস্ত বাড়ীই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী।

সূর্য-দীঘল বাড়ীর ইতিহাস ভীতিজনক। সে ইতিহাস জয়গুন ও শফীর মা-র অজানা নয়।

সে অনেক বছর আগের কথা। এ গ্রামে হাতেম ও খাদেম নামে

দুই ভাই ছিল। ঝগড়া ক'রে ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে যায়। খাদেম আসে সূর্য-দীঘল বাড়ীটায়। বাড়ীটা বহুদিন থেকেই খালি পড়ে ছিল।

এখানে এক সময়ে লোক বাস করত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না। তবুও লোকের ধারণা—সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে থাকবে। নচেৎ এ রকম বিরান পড়ে থাকবে কেন?

যাই হোক, শুভাকাঙ্খীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে খাদেম এসে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করে। কিন্তু একটি বছরও ঘুরল না। বর্ষার সময় তার এক-জোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেল। সবাই বুঝতে পারল—বংশ নির্বংশ হওয়ার পালা সুরু হল এবার। বুড়োরা উপদেশ দিলেন বাড়ীটা ছেড়ে দেয়ার জন্য। বন্ধু-বান্ধবরা গালাগালি সুরু করল—আল্লার দুইন্যায় আর বাড়ী নাই তোর লেইগ্যা। সূর্যু-দীগল বাড়ীতে ছ্যাখ্ কি দশা অয় এইবার!

খাদেমের মনেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সাতদিনের মধ্যে ঘর-দুয়ার ভেঙে সে অন্যত্র উঠে যায়। জয়গুনের প্রপিতামহ খুব সস্তায়, উচিত-মূল্যের অর্ধেক দিয়ে তার কাছ থেকে বাড়ীটা কিনে নেয়। উত্তরাধিকারের সেই সূত্র ধরে জয়গুন ও শফী এখন এ বাড়ীর মালিক।

ঐ ঘটনার পরে অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। এতদিনের মধ্যে আর কোন লোক ভুলেও এ বাড়ীতে আসেনি। আকালের সময় জয়গুন ও শফীর মা এ বাড়ীটাই বিক্রী করতে চেয়েছিল। কিন্তু সূর্য-দীঘল বাড়ী কেউ কিন্‌তে এগোয় নি। তখন এ বাড়ীটা বিক্রী করতে পারলেও জয়গুনের স্বামীর ভিটেটুকু রক্ষা করা যেত; ছেলেমেয়ের বাপ-দাদার কবরে আজ আবার বাতি জলত।

বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ী। সর্বত্র হাঁটু-সমান ঘাস, কচুগাছ, মটকা ও ভাঁট শেওড়া জন্মে অরণ্য হয়ে আছে। বাড়ীর চারপাশে

গোটাকয়েক আমগাছ জড়াজড়ি করে আছে। বাড়ীর পশ্চিম পাশে দুটা বড়া বাঁশের ঝাড়। তা ছাড়া আছে তেঁতুল, শিমুল ও গাবগাছ। গ্রামের লোকের বিশ্বাস এই গাছগুলোই ভূত-পেত্নীর আড্ডা।

অনেকদিন আগের কথা। সন্ধ্যার পর গদু প্রধান সোনাকান্দার হাট থেকে ফিরছিল। তার হাতে এক জোড়া ইলিশ মাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ীর পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে সে শুন্‌তে পায়—অই পরধাইন্যা, মাছ দিয়া যা। না দিলে ভালা অইব না।

প্রথমে গদু প্রধান ভ্রূক্ষেপ করে নি। পরে যখন পায়ের কাছে ঢিল পড়তে সুরু করে, তখন হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে যায়। সে 'আউজুবিল্লাহ' পড়তে পড়তে কোন রকমে বাড়ী এসেই অজ্ঞান।

রহমত কাজী রাত দুপুরের পর তাহাজ্জদের নামাজ পড়বার জন্য অজু করতে বেরিয়ে ফুটফুটে জোছনায় একদিন দেখছে—সূর্য-দীঘল বাড়ীর গাব গাছের টিকিতে চুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে দেখছিল। চোখের পলক ফেলে দেখে, আর সেখানে বউ নেই। একটা ঝড়ো বাতাস উত্তর-পশ্চিম কোনাকুনি করম আলী হাজীর বাড়ীর ওপর দিয়ে চলে গেল। পরের দিনই করম আলী হাজীর 'পুতের বউ' কলেরায় মারা যায়। তার হালের তিনটা 'তর-তাজা' গরু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে খতম।

আরো অনেকের সাথেই নাকি অনেক বেশে দেখা হয়েছে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূতের গল্পের অন্ত নেই। তাই দিন-দুপুরেও পারতপক্ষে এ বাড়ীর পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না।

বাড়ীটার বড় আকর্ষণ একটা তালগাছ। এত উঁচু তালগাছ এ গাঁয়ের কেউ কোথাও দেখেনি। কত শিশুর পরিচয় হল তালগাছটির সঙ্গে। তারা বুড়ো হ'ল, জীবন-লীলা সাঙ্গ করল। তাদের কত উত্তর পুরুষও গেল পার হয়ে। কিন্তু তালগাছটি তেমনি দাঁড়িয়েই আছে

প্রহরীর মত। কালের সাক্ষী হয়ে শত ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা করে রয়েছে মাথা উঁচু করে।

তালগাছটি এ এলাকার গর্বের বস্তু। চরে-চঞ্চালে বিশেষ করে বক্তবলীর চরে গেলে কথায় কথায় যখন কুল-কৌলিন্যের তর্ক ওঠে, তখন এখানকার লোক এ তালগাছটি নজির দেখায়। কেউ কেউ নিজেদের বনেদিপনা জাহির করে। তারা এরকম করে বলে—আমরা অইলাম গিয়া সাবেক মাডির ভর্দ [illegible], বুঝলা নি মিয়া ? আমাগো ঘর বহুত পুরানা। ঐ আসমাইন্যা তালগাছটা সাক্ষী। দেখাও দেহি অত বুড়া আর ডাঙর গাছ একটা তোমাগ মুল্লুকে ? ওহো ঠন্ঠন্। তোমাগ এইদিগের বড় তালগাছ আমাগ গেরামের খাজুর গাছের সমান। আমাগডা হেই মইষখালির হাটের তন দেহা যায়। তোমাগডা অত বড় অইব কেমনে ? এইত হেদিনের চর এইডা। এইখানে আগে আছিল্ গাঙ। তোমরা অইলা চরুয়া ভূত—বাইল্যা মাডির তরমুজ, ইত্যাদি।

অপর পক্ষ রাগ করে না। তারা সব সময় এ সাবেক মাটির বাসিন্দাদের কৌলিন্য স্বীকার করে। বহু টাকা খরচ করেও এদের ছেলেমেয়ের সাথে সম্বন্ধ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। এখানকার বহু কালো-কুৎসিত মেয়ে চরের সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে বিকিয়ে যায় এ কারণেই।

জয়গুন ও শফীর মা সাত-পাঁচ ভেবে এ বাড়ীতে বাস করার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ছেলে-মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করেই নিরস্ত হয়েছিল বিশেষ করে। কিন্তু একদিন নামকরা ফকির জোবেদালী এ সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারকোণে চারটা তাবিজ পুতে এসে সে জানিয়ে দেয়—এইবার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধূলপড়া দিয়া ভূতপেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোণায় চাইড্যা আলিশান আলিশান পাহাড়াদারও

রাইখ্যা আইছি। সব আপদ-বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাড়ীর সীমানার মধ্যে ভূত-পেত্নী, জিন-পরী, ব্যারাম-আজর—কিচ্ছু আইতে পারব না।

জয়গুন ও শফীর মা খুশী হয় ফকিরের ওপর। শফীর মা তার ভিক্ষার ঝুলি খালি করে সোয়াসের চাল দেয় তাকে। জয়গুন দেয় সোয়াপাঁচ আনা পয়সা। কিন্তু ফকিরের মন ওঠেনা। শফীর মা অনুনয় করে—আমরা গরীব-কাঙাল মানুষ। এই এর বেশী আর কি দিতে পারি?

ফকির বলে—আইচ্ছা, এখন যা দিলা খুশী মনেই নিলাম। পরে বাড়ীতে যখন ঠিক-ঠাক অইবা, তখন একটা পিতলের কলসী দিও। আর হোন, তোমাগ বাঁশ-ঝাড়ে বড়া বাঁশ দ্যাখলাম। এক জোড়া বাঁশ দিও আমারে। আমারে দিলে আখেরে কাম দিব।

জয়গুন ও শফীর মা আপত্তি করে না।

ফকির আবার বলে—হোন, আর এক কথা। বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহাড়া বদলাইতে অইব। যেই চাইরজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলা কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিন-রাইত ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধু করা কি সোজা কাণ্ড!

সূর্য-দীঘল বাড়ী মানুষের হাত লেগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। জয়গুন ও শফীর মা আজে-বাজে গাছ-গাছড়া বিক্রী করে টাকার আমদানি করে। তাতে অন্ধকার বাড়ীটায় আলোর আমদানিও হয় বেশ। নিজেদের ঝাড়ের বাঁশ কেটে খুঁটি হয়। খড়ের চালা ও পাটখড়ির বেড়া নিয়ে দুই ভিটেয় দুইখানা ঘর ওঠে। ঘর নয় ঠিক—ঝুপড়ি। রোদ-বৃষ্টি ঠেকানোর আদিম ব্যবস্থা।

বছর বছর পাহারাদার বদলিয়ে তিনটি বছর কেটে গেল সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। কোন বিপদাপদ আজ পর্যন্ত আসেনি। ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া অসুখ-বিসুখও হয়নি ছেলে-মেয়েদের। এজন্যে ফকিরের দোষ দেওয়া যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বর কোন্ বাড়ীতে নেই?

এবার আবার পাহারাদার বদলাবার সময় হয়েছে। একদিন জয়গুনের ঘরে বসে শফীর মা বলে—ফকিরের যে আর ছাহা মিলে না আইজ-কাইল। হেইযে কবে করে আইয়া গেছে। আর একবার সাত-হপনেও ছাহা দিয়া গেল না আমরা বাইচ্যা আছি, না মইর‍্যা গেছি। কেমুনতরো মানু! এই দিগে বছর যে ঘুইর‍্যা গেল। কলসীডা না দেওনে বেজার অইছে বুঝিন।

ফকিরকে তাদের প্রতিশ্রুত পেতলের কলসী দে'য়া হয় নি এ পর্যন্ত। সাত-স্বপ্‌নেও তার দেখা না পাওয়ার কারণ এটা নয়। কারণ অন্য একটা। জয়গুন ছাড়া আর কেউ তা জানেনা।

কলসীর তাগাদা দিতে সে মাঝে মাঝে আস্‌ত। জয়গুন ও শফীর মা নিজেদের উপস্থিত অক্ষমতা জানিয়ে কিছুদিন সবুর করবার অনুরোধ জানাত। শফীর মা বাড়ী থাক্‌লে কখনো লাউ-কুমড়ো, কখনো শশা-বেগুন – যখনকার যা' নিয়ে সে শান্ত হয়ে ফিরে যেত। শফীর মা বাড়ী না থাক্‌লে সেদিন জয়গুনের ঘরের দোর গোড়ায় যেন শিকড় গেড়ে বস্‌ত সে। উঠ্‌বার নামও করত না। কোনদিন সে বল্‌ত—এক খিলি পান ছাও, বেয়ান।

জয়গুনকে 'বেয়ান' আর হাসুকে 'জামাই' বল্‌তে সুরু করেছিল সে।

প্রথম থেকেই লোকটার কথাবার্তা, ভাবগতিক জয়গুনের কাছে সুবিধের মনে হয়নি। সামান্য একটা পেতলের কলসীর জন্যে এত ঘন ঘন কেন সে আসে? বেয়ান বলে এত ঘনিষ্ঠতাই বা করতে চায় কেন? কি মতলব?

জয়গুনের মনে সন্দেহ। কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না। যে লোকটা এত উপকার করল, তাকে কটু কথা বল্‌তেও বাধে।

জয়গুন একটা আস্ত পানে সুপারি, চুন ও খয়ের দিয়ে এগিয়ে দিত।

ফকির বল্‌ত—বেয়াইরে খিলি বানাইয়া দিলে বুঝিন্ জাইত যায়,

না ? কতদিন খোসামুদ কইর‍্যাও তোমার আতের একখানা খিলি পান খাইতে পারলাম না। মইর‍্যা গেলেও হায় আফ্‌সোস্‌ থাকব।

জয়গুন কোন উত্তর দিত না।

পান খেতে খেতে ফকির নানা রকমের কথা বল্‌তে সুরু করত। কখনো কোন প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য হা করে থাকৃত। উত্তর না পেয়ে আবার শুরু করত। মাঝে মাঝে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠ্‌ত। লাগামছাড়া হাসি। জয়গুন এ অস্বস্তিকর হাসি-ঠাট্টায় জ্বলে উঠ্‌ত মনে মনে। পিছু-তুয়ার দিয়ে একসময়ে সরে পড়ত।

একদিন রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে কোথা হতে ফকির এসে হাজির। জয়গুন পান খেতে বসেছিল। ফকিরের আগমনে সে একটু সচকিত হয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়ে তু'টি ঘুমিয়ে পড়েছে। শফীর মা-ও বাড়ী নেই আজ।

ফকির দরজার ওপর বসে পান চিবোতে চিবোতে একসময়ে বলে— বেয়ানের আতের পান খাইতে কি মুলাম। এক্কেরে মোখের সাথে মিশ্যা যায়। যেই আতের পান এত মুলাম, হেই আতখান্‌ও না জানি কেমুন। শরীলখানও বুঝিন্‌ তুলতুল করে তুলার মতন।

ফকির হাসে। জয়গুনের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। শক্ত একটা কিছু বল্‌তে যায়। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোয় না।

—দেহি না, বেয়ান! বল্‌তে বল্‌তে সে এগোয়—দেহি না তোমার নরম আতখানে কি লেখা আছে।

জয়গুন পিছিয়ে যায়। বেড়ার সাথে গিয়ে ঠেকে।

—দেহি না আতখান। নওল মুরগীর মতন পালাও ক্যান্‌? ছি, ছি!

ফকির হাত বাড়াতেই জয়গুন হাতের কাছের চুনের ঘট্‌টা ছুঁড়ে দেয় ফকিরের মুখের ওপর। চেঁচিয়ে ওঠে—কুত্তার পয়দা! বাইর অ, বাইর অ ঘরতন।

এ ব্যাপারের পর জোবেদালী ফকির আর তার চুন-কালির মুখ সূর্য-দীঘল বাড়ীতে দেখায়নি।...

জয়গুন শফীর মা-র কথার উত্তর দেয়—বেজার অইলে অউক গিয়া। দিমু না কলসী, কাম নাই আর পাহাড়াদারের।

শফীর মা জয়গুনের ভাবান্তরের কারণ খুঁজে পায় না। জয়গুন এমন অকৃতজ্ঞ হল কেমন করে? আর পাহারাদার ছাড়া সূর্য-দীঘল বাড়ীতে থাকবার সাহসই বা তার কোথেকে হ'ল?

দুই

পাশাপাশি পিঁড়ে বিছিয়ে বসে দু'টি ভাই-বোন—হাসু ও মায়মুন। জয়গুন পান্তা বেড়ে ছেলে ও মেয়ের সামনে দুটো থালা এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা নিয়ে বসে। মায়মুন আড়-চোখে হাসুর থালার দিকে চায়, রোজ সে এম্নি চেয়ে দেখে। রোজই হাসুকে বেশী করে খেতে দেয় মা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস তার হয় না। জয়গুন বুঝতে পেরে নিজের পাতের একমুঠো ভাত দিয়ে বলে—বিছ্ মিল্লা বুইল্লা মোখে দে। দেখবি এই দুগায়ই পেট ভইর‍্যা যাইব।

—বিছ্ মিল্লা।

হাসুও বলে—বিছ্ মিল্লা।

প্যাচপেচে পান্তাভাত। পোড়া মরিচ মেখে কালো করে নেয়। খেতে খেতে জয়গুন সারাদিনের কাজের ফরমাস করে যায় মায়মুনকে। ঘর ঝাঁট দে'য়া, থালাবাসন মাজা, পানি আনা, ইত্যাদি।

—ভাত আছে আর, মা? হাসু বলে।

ভাতের হাঁড়িটা হাসুর থালার ওপর উপুড় করে ঢেলে দিয়ে জয়গুন বলে—খাইয়া নে, পরাণ ঠাণ্ডা অইব।

শুধু পানিতে থালা ভরে যায়। মায়মুনের পাতে তার আধাটা ঢেলে দিয়ে লবণ দিয়ে ঘেটে চুমুক দেয় হাসু।

খাওয়ার পরে জয়গুন পানের ডিবা নিয়ে বসে। পেট ভরে দু'টি ভাত খেতে না পেলেও পান-টান একটু মুখে দিলে তবু ভালো লাগে।

হাসু কোষার পানি সেচে ডাকে—মা, শীগ্‌গীর। গাড়ী কইলাম আইয়া পড়ল বুইল্যা।

জয়গুন বাঁশের চুঙির থেকে পাঁচটা টাকা বের করে নেয়। এই টাকা ক'টিই তার মূলধন। ময়মনসিং থেকে সস্তায় চাল এনে সে গাঁয়ে বিক্রী করে। এই করে টাকা প্রতি একসের সোয়াসের মুনাফা হয় প্রতি ক্ষেপে। আঁচলে সব কটি টাকা বেঁধে চটের দুটো ঝুলি হাতে বেরিয়ে পড়ে তারপর।

দশবছরের মেয়ে মায়মুন। কিন্তু সাত বছরের বেশী বলে মনে হয় না। হাঁটতে গেলে পাক খেয়ে পড়ে যাবে মনে হয়। একা একা কাজ করতে ভালো লাগে না ওর। কিন্তু কাজের কোনোটা বাকী রাখলে চুল এক গাছাও মাথায় থাকবে না, সে জানে। শীর্ণ শরীরটাকে টেনেটুনে কোন রকমে মাজা-ঘসা করে। বদনা ভরে ভরে সাত আটবারে পানির কলসীটা ভরে সে।

আজ হাঁস দুটো ছাড়তে গিয়ে খাঁচার নীচে ডিম দেখে মায়মুনের আর আনন্দ ধরে না। তাদের হাঁস ডিম দিয়েছে আজ নতুন। কী সাদা আর বড় বড়! দু'হাতে দুটো ডিম নিয়ে সে নাচতে আরম্ভ করে। লাফাতে লাফাতে সে বাইরে আসে। দৌড়ে যায় শফীর মা-র ঘরে। ডাকে—মামানি-গো, অ মামানি, ছাহ কী সোন্দর আণ্ডা। আমাগ অাঁস পাড়ছে। উল্লাস যেন সে ধরে রাখতে পারে না।

—দেহি দেহি—বলে মামী হাত পেতে ডিম দুটো নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর হেসে বলে—ভালা আণ্ডা অইত। পয়লা

বারের অইলেও ডাঙর-ডাঙর অইছে। আষ্ট পয়সা কইরা বেচতে পারবি এক একটা।

—নাগো মামানি, এ আণ্ডা বেচতাম না।

—খাবি ?

—ওহোঁ। বাচ্চা ফুডাইমু।

—বেইশ, বেইশ। মামী উৎসাহ দিয়ে বলে।

ডিম ছুটো তুষের হাঁড়ির মধ্যে রেখে মায়মুন বাড়ীর এদিক-ওদিক খুঁজে খুঁজে গাছের শুকনো ডাল ভাঙে। আজ তার কাজ করতে খারাপ লাগেনা। আর-দিনের চেয়ে অনেক বেশী লকড়ি যোগাড় করে ফেল্‌লে সে।

বিকেলবেলা মায়মুন বড়শী নিয়ে তেঁতুলতলা গিয়ে বসে। যাবার আগে আণ্ডা ছুটো আর একবার দেখে যায় ছুই চোখে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ও বসে থাকে বড়শী নিয়ে। পিঠালি সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মাছ ওঠে মাত্র একটা ট্যাংরা, তিনটে পুঁটি আর কয়েকটা ডানকানা। মাছগুলো যেন ওর চেয়েও চালাক হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে সাঁঝ-বাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয় মায়মুন। আবছা অন্ধকারে বসে মাছ কয়টা কুটে লবণ দিয়ে রাখে।

রাত নয়টা-দশটা পর্যন্ত অন্ধকারে ওকে একা-একা বসে থাকৃতে হয় প্রায়ই। মায়মুনের বড় ভূতের ভয়। কোন কোন দিন সে শফীর মা-র ঘরে গিয়ে কেচ্ছা শোনে। তার পান ছেঁচে দেয়। কিন্তু আজ সে ছুপুর বেলা বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। ভিক্ষে করে খায় সে। মাঝে মাঝে বাড়ীও আসে না। মায়মুন দোরের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে চুপ-চাপ পড়ে থাকে।

রাত গোটা নয়ের সময় হাসু আর হাসুর মা আসে। শব্দ পেয়ে মায়মুন মাথার ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে।

—ময়মন্, অ ময়মন্। হাসু ডাকে।

মায়মুন এবার লাফ দিয়ে ওঠে। খুশীতে আট্খানা হয়ে সে বলে—মা, মা, আমাগ আঁসে আণ্ডা পাড়ছে। বল্তে বল্তে সে বের করে আনে ডিম হু'টো। হাসু খুশী হয়ে ওঠে। হাতে নিয়ে দেখে, কী সুন্দর, সাদা আর বড়!

হাসু বলে—কাইল অই আণ্ডা বিরন খাইমু মা, পান্তাভাত দিয়া।

—ইস্! বাচ্চা ফুডাইমু আমি। প্রতিবাদ করে বলে মায়মুন।

জয়গুন বলে—ওহোঁ। পয়লা দিনের আণ্ডা। আণ্ডা দুইডা জুম্মার ঘরে দিয়া আ'বি নামাজের দিন।

ভাই-বোন হু'জনেরই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

জয়গুন তাড়াতাড়ি চুলো ধরায়। মুঠ্ মেপে ছয়মুঠো, ভোরের জন্যে আরো ছয়মুঠো নিয়ে হাঁড়ি বসায় চুলোর ওপর। ছেলেকে হুকুম দেয় কয়েকটা কুমড়ো পাতা তুলে আন্তে। নিজে সে যায় না। বাচ্চা-কাচ্চার মা, রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।

ভাত ফুটিয়ে মায়মুনের ধরা মাছ কয়টা রাঁধতে দেরী হয় না।

তিনটি বাসনে ভাত বাড়ে জয়গুন, আর আন্দাজ করে—হাঁড়িতে কতটা আছে। ফেনটাও ভাগাভাগি করে নেয়। খেতে খেতে হাসু বলে—ফেনভাত খুব ঘন, মা, মিডা মিডা লাগে।

—নয়া আউস যে। এর লেইগ্যাইত আউস চাউল আন্লাম। দরেও হস্তা। ফেনডাও অয় ভালা। কিন্তু ভাতে বাড়ে না এক্কেরেই। অ্যারে হাসু, নারানগঞ্জে চাউল কি দর দেখ্লি আইজ?

—ট্যাকায় দেড়সের, মা।

—কি পোড়ার ছ্যাশ ছ্যাখ্ দেহি। উত্তরে এডুক হস্তা না অইলে শুকাইয়া তেজপাতা অইয়া যাইতাম না! আইজ আড়াই সের ভাও আনলাম। আমন চাউল দুই সের কইর‍্যা।

—আমি একদিন তোমার লগে উত্তরে যাইমু, মা।

—ওহোঁ। কাম কামাই দিয়া তোমার উত্তরে যাওনের দরকার নাই, বাজান।

খাওয়া শেষ হলে জয়গুন হাঁড়ির ভাতগুলিতে পানি ঢেলে রাখে। ছেলে-মেয়ের জন্য তেলচিটে একটা লম্বা ব.লিশ নামিয়ে দেয়। হাসু ও মায়মুন শুয়ে পড়ে। জয়গুন পানের ডিবাটা নিয়ে বসে এবার। আজ আর পানের ডিবা নেওয়ার কথা মনে ছিল না তার। গাড়ীর মধ্যে ছমুর মা-র কাছ থেকে চেয়ে একবার মুখে দিয়েছে একটু। আর সারাদিনের মধ্যে সে পান খায়নি। তবু হাসু অনুযোগ দেয়—পান খাওয়া ছাইড়্যা ছাও, মা। পান আর আনতাম না আমি। চাইর পয়সা কি কম ?

পান খাওয়া সে অনেক কমিয়েছে। চার পয়সার পানে দুই দিন যায় আজকাল।

পান চিবোতে চিবোতে সে সারাদিনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে চেষ্টা করে।

রাত অনেক হয়েছে। কুপিটা নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

তিন

আজকের ডিম দুটো মায়মুনের। সে বাচ্চা ফুটাবে। মা রাজী হয়েছে। সারারাত তার ভালো ঘুম হয়নি। তার ছোট মনে কত কল্পনা জেগেছে। হাঁসের বাচ্চা হবে, সেগুলো বড় হবে, ডিম দেবে—ফকফকে সাদা ডিম। সেই ডিমের থেকে আবার বাচ্চা হবে। নানা রঙের হাঁসে তাদের খাঁচা ভরে যাবে। স্বপ্নেও সে দেখলে, রঙ-বেরঙের হাঁসের সারি চলছে ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে। ডিম কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে একটা হাঁড়ি ভরে ফেলেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে হাঁস দুটো ছাড়তে যায়। ঠিক ঠিক দুটো ডিমই পেড়েছে আজো। ডিম দুটো তুলে তুষের হাঁড়ির মাঝে রেখে দেয় আলাদা করে। সেখানে আগের দুই দিনের আরো চারটে রাখা হয়েছে। এক দুই করে গুনে দেখে মায়মুন একবার। তারপর হাঁস দুটো দুই কাঁখে করে নিয়ে যায় পানির ধারে। বর্ষায় ডোবা মাঠ, হাঁস দুটো ছেড়ে দিয়ে সে চেয়ে থাকে। দুই-তিন বার পাখা ঝাপটা মেরে হাঁস দুটো ভেসে যায় ধানক্ষেতের দিকে। মায়মুনের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। হাত-মুখ ধুয়ে মায়মুন ঘরে আসে। ডিম দুটো সে বুকের সাথে চেপে ধরে খুশীতে। জয়গুন বলে—অই রকম কইর‍্যা ধইর‍্যা রাখলে-অই বাচ্চা অইব? বেবাকগুলা আণ্ডা লইয়া আয় আমার কাছে। বাছাই কইর‍্যা দেই। যেই আণ্ডাডা লম্বা হেইডায় অইব আঁসা, আর যেইডা গোল হেইডায় অইব আঁসি।

গোল দেখে দু'টো ডিম বেছে মায়মুনের হাতে দিয়ে সে আবার বলে —অই পাড়ায় গিয়া ছাখ্। কেওর মুরগীর উমে দিতে পারস যদি। হাসুও যা অর লগে। তোর আর আউজকা কামে যাওন লাগ্ত না।

এ কথায় রীতিমত খুশী হয়ে ওঠে হাসু।

জয়গুন আরো বলে—দুফরে যাবি জুম্মার ঘরে। আণ্ডা চাইড্যা দিয়া আ'বি।

—চাইড্যা অই? হাসু আশ্চর্য হয়ে যায়।—তুমি না হেদিন কইলা, পয়লা দিনেরডা কেবল?

—দুইডা আণ্ডা জুম্মার ঘরে কেমুন কইর‍্যা দেই, পাগল। এক আলির কমে—

—আমরা খাইমু না বুঝিন্ একটাও?

—তুই আছস্ তোর পেট লইয়া।

খেয়ে-দেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ে।

বর্ষার সময় বাড়ীর চারদিকে থাকে পানি। বিলের মাঝে একটা দ্বীপের মত যেন। এ সময়ে নৌকো ছাড়া চলবার উপায় থাকে না। তারা সকলে তাদের কোষায় চড়ে ও পাড়ায় যায়। জয়গুন নামে মোড়ল বাড়ীর ঘাটে। সেখানে সে মাঝে মাঝে মোড়লদের ধান ভানে, চিড়া কোটে, ঘর লেপে দেয়।

হাসু ও মায়মুন পাড়াময় ঘুরে শেষে দিয়ে এল ডিম দুটো। পাঁচ-সাতদিন পরে বসবে সোনা-চাচীর মুরগী। তার ফুটবে চৌদ্দটা ডিম। তবু সে বলেছিল—দুটো বাচ্চা হলে তাকে একটা দিতে হবে। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছে।

গ্রামের মসজিদ। জুম্মার নামাজ হচ্ছে। হাসু বাহিরে দাঁড়িয়ে দেখে। সব লোক এক সঙ্গে উঠছে, বসছে, সেজদা দিচ্ছে। হাসুর কেমন ভয় হয়। তারও নামাজের বয়স হয়েছে। সে ভাবে—বারো বছরের হলেই ত নামাজ পড়তে হয়।

নামাজ শেষ হলে হাসু গামছায় বাঁধা ডিম কয়টা নিয়ে এগোয়। একজন নামাজী শিন্নি বিলিয়ে দিচ্ছিল সকলের মধ্যে। গামছা খুলে হাসু তার হাতে দিয়ে দেয় ডিম কয়টা।

ইমাম সায়েবের চোখ এড়ায় না। তিনি ডেকে বলেন – নিয়া আস আণ্ডা কয়ডা এদিগে।

কাছে যেতে আবার বলেন – যাও, দিয়ে আস গিয়ে আমার ওখানে। কে দিল হে ?

—ঐ যে ঐ ছ্যাড়া। আঙ্গুল দিয়ে দেখায় সে।

একজন বলে—সূর্য-দীঘল বাড়ীর।

আর একজন বলে—চিনেন না হুজুর ? জব্বর মুন্সীর পোলা।

ইমাম সায়েব চম্‌কে ওঠেন—ও-ওই। তওবা! তওবা! হারাম! হারাম!

তিনি ডিম কয়টার দিকে তর্জনীর নির্দেশ দিয়ে বলেন—নিয়ে যাও জলদি আমার কাছ থেইকা। মস্‌জিদের মধ্যে কে আন্‌ল এই আণ্ডা? ফিরাইয়া ছাও অখুনি। বেপর্দা আওরতের চীজ। ছি! ছি! ছি! তাঁর চোখে-মুখে ঘৃণার তীব্রভাব ফুটে ওঠে।

একজন ইঙ্গিত করে—একলা একলা সে মমিনসিং যায় টেরেনে কইর‍্যা। কী হিম্মত!

ইমাম সায়েব বলেন—দেখ্‌লা মিয়া, ইমানদারকে খোদাওন্দ করিম হারাম থেইকা কিভাবে হেফাজত করেন।

আর একজন বলে—জব্বর মুন্সী কত পরহেজগার আছিল্‌। খোদার এমন পিয়ারা আছিল্‌। আর তার পরিবার!

হাসু রেগে ওঠে মনে মনে। একবার ইচ্ছে হয় দেয় ছুঁড়ে ডিম কয়টা ইমামের মুখের ওপর। কিন্তু সাহস হয় না। ডিম কয়টা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে।

কোষাটাকে সে জোরে বেয়ে নিয়ে যায়। আজ অনেকগুলি ট্রেন ও ষ্টীমার ফাঁক গেল। তুটোর জাহাজটা ধরা চাই-ই চাই। তুটো মোট পেলেও ছয় আনার কাজ হবে।

তুটোর জাহাজ আর বিকেল পাঁচটার ট্রেন ধরে সে আসে বাজারে। ডিম চারটে সে বিক্রী করেই ফেল্‌বে। কেন দেবে সে মসজিদে? মা জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, জুম্বার ঘরেই দেওয়া হয়েছে।

ডিম কয়টায় সাত আনা পেয়ে সে পাঁচ আনায় চারগাছা কাঁচের চুড়ি কেনে মায়মুনের জন্য, আর নিজের কোমরে বেঁধে পয়সা রাখবার জালি একটা। বাকী তু'আনার এক আনায় কেনে একটা চরকী ও এক আনায় চারটে তিলের কদ্‌মা।

সন্ধ্যার দিকে সে কোষা ভিড়ায় একটা বাড়ীর ঘাটে। চারদিক চেয়ে সে চুপিচুপি ডাকে—কাসু, অ কাসু।

বছর সাতের একটি ছোট্ট ছেলে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। হাসু ওকে কোলে তুলে নেয়। তারপর ওর মুখে একটা কদ্‌মা দিয়ে বলে– দ্যাখ দেখি কেমুন মিষ্টু। এই চরকিডাও তোর লেইগ্যা আন্‌ছি। দ্যাখ কেমুন সোন্দর ঘোরে।

কাসু খুশী হয় খুব। হাসু বলে– যাবি তুই আমার লগে? মা তোর লেইগ্যা কত কান্দে দিন-রাইত।

—ক্যার মা?

– তোর মা। আমার মা।

—হুঁ, মিছে কথা।

—না বলদ, সত্যই।

মা-র কথা শুনে কাসু যেন কেমন হয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার চোখ টল্‌টল করে। কাসু কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সে জানে, তার মা মরে গেছে। বাপ ত সেই কথাই বলে সব সময়।

—যাইমু তোমার মা-র কাছে। কাসু বলে।

-- আমার মা যে তোরও মা অয়, বলদ।

—কে? কে? কেডারে অইখানে? কাসুর বাপ করিমবক্‌শ চিৎকার করে ওঠে। তেড়ে আসে লাঠি হাতে।—খাড়া, হারামীর পয়দা। কান কথা দিতে আইছ আমার পোলারে?

কাসুকে কোল থেকে নামিয়ে বাকী কদমা তিনটে ওর হাতে দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড় দেয় হাসু। কোষাটা ঠেলা দিয়ে চড়ে বসে। প্রাণপণে বেয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কাসুর বাপ করিমবক্‌শ পানির কিনারা পর্যন্ত এসে বাধা পায়।

চেঁচিয়ে বলে—আবার এই মুখী পাও বাড়াইলে আড্ডি গুড়া কইর‍্যা ফালাইমু। মানুষ চিন না বজ্জাতের বাচ্চা।

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কয়েকটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুড়তে থাকে ওর দিকে। একটা ঢেলা এসে হাসুর পিঠের ওপর পড়তেই সে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে যায়। কোষার আবডালে থেকে আত্মরক্ষা করতে থাকে। করিমবক্‌শ চলে যেতে সে কোষায় চড়ে জোরে লগির খোঁচ দেয়।

কাসুদের বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ শোনা যায়, সাথে সাথে গর্জনও—হারামজাদা, কদমা দিয়া ভুলাইতে আইছস। আবার আইলে বাপের মরণ দেহাইয়া ছাইর‍্যা দিমু।

আবার শোনা যায়—চরকি! দ্যাখ অহন চরকিবাজী কেমুন লাগে।

হাসুর চোখে পানি আসে। পিঠের ব্যথার কথা ভুলে যায় সে। কাসু যে তারই এক-মার পেটের ভাই। হোক্ না বাপ ভিন্ন। কিন্তু মা-ত একজনই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর এ মুখো হবে না। তার জন্যেই কাসু আজ মার খাচ্ছে।

মোট বয়ে আজ ছয় আনা পেয়েছে হাসু। বাড়ী এসেই মা-কে দেয় তিনটে দু'আনি।

মা বলে—এই পাইলি আইজ?

—গেলাম ত দুফরের পর, আরঅ? বলেই হাসু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মায়মুনকে ডাকে—দেইক্যা যা মায়মন্, কি আনছি।

নতুন কিছু দেখবার জন্যে মায়মুনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসু চুড়ি চারগাছা ওর হাতে পরিয়ে দেয়। মায়মুনের মুখ আনন্দে ভরে যায়।

জয়গুন বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়ে বলে—চুড়ি কিন্‌লি, পয়সা পালি কই?

—আজ পথে যাওনের কালে একটা পোঝা পাইয়া গেলাম। আমতা আমতা করে হাসু বলে।

—চুড়ি তোমাকে কে কিন্‌তে কইছে? রাগতভাবে বলে জয়গুন।

হাসু কোন উত্তর দেয় না। তার এই চুপ করে থাকাটা জয়গুনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দাঁত কিড়-মিড় করে বলে—খাইতে নাই শুইতে রাঙ্গা পাড়ি। আইজ রাইতে ভাত নাই তোর কপালে।

মায়মুন মুখ কালো করে দূরে সরে যায়। হাসু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েই থাকে।

জয়গুন আবার বলে—আণ্ডা কই?

—জুম্মার ঘরে দিয়া দিছি। বলেই হাসু শিউরে ওঠে।

—জুম্মার ঘরে! তুমি বুঝছ, আমি কিছুই জান্‌মু না। মোড়ল বাড়ীর তন বেবাক হুইন্যা আইছি। হুজুর ফিরাইয়া দিছেন আণ্ডা।

হাসুর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। চাপে পড়ে সত্য কথাটাই বলে সে—বেইচ্যা ফালাইছি।

—পয়সা দে।

—চুড়ি কিন্‌ছি, পয়সা রাখনের জালি আর—জয়গুন এবার বেরিয়ে আসে বাঘিনীর মত—আর কাসুর লেইগ্যা চরকি আর কদমা।

বাঘিনীর তেজ মিলিয়ে যায় শুধু একটা নামে। কি মধুর নাম! কাসু! রাগের মাঝে বাৎসল্যের হঠাৎ আবির্ভাব সে সহ্য করতে পারে না। সরে যায় সেখান থেকে।

খাওয়ার সময়ে আবার তাদের কথা হয়। মা বলে—কাসু কতখানি ডাঙর অইছে রে?

—মায়মনের মত অত বড় অইছে, মা।

একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। হাসু ও মায়মুন চকিত হয়ে মা-র

দিকে চায়। হাসু এবার অন্য কথা পাড়ে—তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইন্‌ষে কত কথা কয়, বেপর্দা—

ছেলের পাকামি দেখে জয়গুন ধমক দেয়—বাইরে যাইমু না? ঘরে আইন্যা কে মোখের উপুর তুইল্যা দিব?

—আমি যা পাই। না পাইলে না খাইয়া মইর্যা যাইমু। হেইঅ ভালা ত মাইন্‌ষের কথা আর সয় না।

হাসু সারাদিনে দশ-বারো আনা পায় মোট বয়ে। এ দিয়ে তিনটি প্রাণীর এক বেলাও চলে না। জয়গুন বাধ্য হয়েই ঘরের বার হয়েছে আজ অনেক দিন। সে বাড়ী বাড়ী ঘর লেপে, ধান ভানে, চিড়া কোটে। সস্তায় চাল কিন্‌তে যায় উত্তরে। গাড়ীতে করে যায়, ভাড়া লাগে না। গাঁয়ের লোকের কথায় তার গা জ্বালা করে। তাদের নিষেধ মেনে চললে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে, সে জানে।

জয়গুন এবার বলে—খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর্যাও খাই না, খ'রাত কইর্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা'।

কঠিন তার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়—সে খোদার কাছে পাপ করছে। বাড়ীর বার হয়ে খোলা রাস্তায় সে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। গাড়ীতে কত বেগানা মানুষের মাঝে বসে সে চলে। বেপর্দা মেয়েলোকের কি 'আজাব' হয়, সে জানে। তার প্রথম স্বামী—হাসুর বাপ মুন্‌শী ছিল। পুঁথি পড়ে শোনাত দোজখের শাস্তির বিবরণ। পুথির কয়েকটা লাইন তার আজো মনে পড়ে,—

মুখের ছুরুত যার পুরুষে দেখিবে।
বিছা, বিচ্ছু, জোঁকে তারে বেড়িয়া ধরিবে॥
যে চুল দেখিবে তার পুরুষ অচিন।
সাপ হইয়া দংশিবে হাশরের দিন॥

যে নারী দেখিবে পর-পুরুষের মুখ।
শকুনি-গিরধিনী খাবে ঠোকরাইয়া চোখ॥

জয়গুন শিউরে ওঠে। সাপ, বিচ্ছা, জোঁক……! তার প্রথম স্বামীর মুখখানাও মনে পড়ে যায়। কী সুন্দর চাপদাড়ি-শোভিত মুখখানা জব্বর মুন্‌শীর! বেহেস্ত-দোজখের কত কথাই সে বল্‌ত। বেহেস্তের কত সুখ! আর দোজখ! দোজখের নামে আর একবার আঁতকে ওঠে সে। তার বিশ্বাস, হাশরের দিন জব্বর মুন্‌শী কিছুতেই তাকে তার বেপর্দার জন্য নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না।

তারপর তার মনে পড়ে করিমবক্‌শের কথা। জব্বর মুন্‌শীর মৃত্যুর পর জয়গুন তার মান-ইজ্জতের ভার দিয়েছিল তার ওপর। কিন্তু সে তা রাখতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে সে জয়গুনকে তালাক দেয়।

'পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ॥'

সমাজের এই নীতি-নির্দেশে তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে গেল করিমবক্‌শের কাছে, আর মায়মুন ও কোলের মেয়েটির পরিত্যক্তা মায়ের কোল ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় রইল না।

কোলের মেয়েটি দুর্ভিক্ষের বছর মারা যায়।

হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চল্‌ছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে কূল সে পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে, ছেলে-মেয়েকে বাঁচাতে হবে। এই সঙ্কল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর লড়াই করে আস্‌ছে সে।

আরো অনেক কিছু ভাবছিল জয়গুন। ছেলের ডাকে তার ধ্যান ভেঙ্গে যায়।

—তুমি খাও না, মা।

ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মমতায় তার বুক ভরে ওঠে। দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবনধারণের কাছে ধর্মের বারণ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যা হয়ে যায়।

চার

রেল-রাস্তার ধারে মা-কে নামিয়ে দিয়ে হাসু কোষাটা ডুবিয়ে রাখে। কেউ নিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সে তার ওপর কচুরী চাকা দিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার সে। কারণ বর্ষার দিনে কোষাটা তাদের চলাফেরার একমাত্র সম্বল।

হাসু গাড়ীর দেরী বুঝে রেল-রাস্তা ধরে দক্ষিণমুখী পথ নেয়, নারায়নগঞ্জের দিকে। রেল ও স্টীমারের বড় স্টেশন সেখানে। আজ তিন মাইল রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে। আর সব দিন গাড়ীর পা-দানের ওপর দাঁড়িয়ে হাতল ধরে দিব্যি এতটা রাস্তা সে পার হয়ে যায়।

জয়গুন কতুল্লা স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। ট্রেন আসার অনেক দেরী। সে এদিক ওদিক খুঁজে দু'জন সাথী যোগাড় করে নেয়।

নয়টার ট্রেন আসে দশটারও পরে। এখানে এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না গাড়ী। ভিড়ের মাঝে সঙ্গিনীদের সাহায্যে জয়গুন কোন রকমে উঠে পড়ে। মেঝেতে একটু জায়গা নিয়ে থলে বিছিয়ে বসে। জয়গুনের সাথী দু'টি—গেদির মা, লালুর মা-ও বসে নীচে। গেদির মা-র সাথে পাঁচ বছরের গেদি। লালুর মা বিরক্ত হয়, বলে—মাইয়া থান্ বাড়ীত্ থুইক্যা আইতে পার না, গেদির মা ?

—বাড়ীত্ কার কাছে রাখি, বইন ?

— ভিড়ের মইধ্যে নিজেরই চলন দায়, তুমি আবার—

—তুমি কি ক্যালাইয়া দিতে কও মাইয়াডারে? গেদির মা রুষ্ট হয়ে বলে।

—না, না, হেইয়া কইমু ক্যা? কইছিলাম তোর কষ্ট দেইক্যা।

—কষ্ট অইলে আর কি করমু, বইন। অদিষ্টে কষ্ট থাকলে খণ্ডাইব কে?

—এক কাম কর না। মাইয়াডার বিয়া দিয়া দে।

—মোডে পাঁচ বচ্ছর বয়স। এত শিগ্‌গীরে!

—এই আর কি এমুন? মাইয়াডাও খাইতে-লইতে পারব, তুইও নিভাবনায় থাকবি।

জয়গুন রাস্তাঘাটে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। সে কথা বড় কয়না। এখনও লজ্জাকে সে জয় করে উঠতে পারেনি। তার কান অন্য দিকে। ওপাশে আলোচনা হচ্ছে—দেশ স্বাধীন হবে, চাল সস্তা হবে, এই সব।

চার-পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে তখন আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। জনকয়েক একটা বাঙলা খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকে আছে, বাকী সবাই শুনছে ওপাশের আলোচনা।

একজন বলে—এই বচ্ছর আকালের নমুনা দেহা যায়। চাউলের দর এক্কই চোডে আটতিরিশ অইছে।

আর একজন সায় দিয়ে বলে—আকাল অইব না আবার! মানুষ কি আর মানুষ আছে? পাপে ডুইব্যা গেছে দ্যাশ। দেইক্যো মিয়ারা, আধা মানুষ মইর্‌যা যাইব এইবার। পাপ পাপের বাপেরেও ছাড়ে না।

অন্য একজন বলে—পঞ্চাশ সনের চাইয়া বড় আকাল অইব এইবার।

একজন প্রতিবাদ করে—না মিয়া, দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুখ্‌খু থাকবনা কারুর, হুনছি আমি। স্বাদীন অইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মত ট্যাকায় দশসের।

—ও মশাই, আপনের খবরিয়া কাগজে কি লেখ্ছে ? জোরে জোরে পড়েন না হুনি।

যে লোকটি খবরের কাগজ পড়ছিল, সে জোরে পড়তে আরম্ভ করে—১৫ই আগষ্টের মধ্যে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে।—

—ও মশাই, ওডা ক্যার ছবি ? একজন জিজ্ঞেস করে।

—জিন্নাহ্ সা'বের। খবরের কাগজের পাঠক বলে।

আবার তর্ক। একজন বলে—জিন্না সা'বই রাজা অইব। খুব বড় মাথা লোকটার।

অন্য দিক থেকে আর একজন বলে—গান্ধী অইব এই দ্যাশের রাজা।

এ নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক চলে। মাঝ থেকে একজন বলে—সুভাস বসু থাক্লে সে-অই রাজা অইতেন।

—আইচ্ছা মামু, স্বাদীন অইলে খাজনা দিতে অইব নি ?

—না, না, খাজনা দিলে আবার স্বাদীন অইল কি ?

অপর একজন বলে—না মিয়া, রাজার খাজনা মাপ নাই, দিতেই অইব।

জয়গুন মন দিয়ে শোনে সব কথা। একটি কথাই তার ভালো লাগে, আশা জাগে মনে—চাল সস্তা হবে, কারো কোন কষ্ট থাক্বে না।

—হাসুর মা।

জয়গুন তাকায়। লালুর মা বলে—মোখ বুইজ্যা বইয়া আছ যে। এই দিগে কত কি অইয়া গেল !

—কি ? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে জয়গুন।

—আমার লালুর বিয়া ঠিক কইর্‌য়া ফেল্লাম। এই দ্যাখ্ বউ

লালুর মা গেদিকে আরো কাছে টেনে নেয়।

জয়গুন একটু হাসে শুধু। লালুর মা বলে—বউ কেমুন অইব ভাখ দেহি।

—ভালা। জয়গুনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

লালুর মা খুশী হয়। সে গেদির মাকে বলে—গয়নার লেইগ্যা তুমি অমন কইর‍্য না গো। আমিত কইছি—কানে কানফুল, নাকে নাকফুল আর বালি, আতে বয়লা, পায়ে ব্যাকখাড়ু দিমু। তয় রূপার দিতে পারতাম না, বইন।

—ওঁহো, হেইয়া অইব না। তুমি বেবাক ক্যামিকল আর বেলী দিয়া চালাইতে চাও। না বইন, রূপার একপদ জিনিস দিতেই অইব। আর গলার অড়কল আর কোমরের নাবীসঙ্গ। আমার গ্যাদা মাইয়ার নাবীসঙ্গ না অইলে কেমুন ছাহা যাইব।

ঢাকা স্টেশন। লোক নামে, লোক ওঠে। ভিখারীও ওঠে নানা রকমের—কানা, খোঁড়া, বোবা। একজন অন্ধ করুণ সুরে বলে যায়—

যেজন করিবে দান অন্ধ-মিসকিনে।
বক্‌শীশ পাইবে সেই হাশরের দিনে॥
এক পয়সা যেই দিবে খুশী-খোশালিতে।
সত্তর পয়সা পাইবে আল্লার রহমতে॥
বরকত হইবে তার রুজি-রোজগারে।
বাল-বাচ্চা জিন্দা রবে সুখের সংসারে॥
আ — ল্লা — হ্ !

অন্ধ হাত পাতে—ছান বাবা একটা পয়সা।

একজন যাত্রী বলে—এক পয়সা কি আর আছে বাপু।

মসজিদের চাঁদার জন্য আসে লোক। রীতিমত বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে—জয়নগর মস্‌জিদের জন্য দান করুন। এর ফল পাবেন

কেয়ামতের দিন, পুল-সেরাতের দিন। এই টাকায় বেহেস্তে ফুল-বাগিচা হবে, দালান-বালাখানা হবে।

দু'এক পয়সা কেউ দেয়, অনেকেই দেয় না। কেউ বলে—এদের এই একটা পেশা।

গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করলে লালুর মা আবার মুখর হয়ে ওঠে—নাবীসঙ্গ দিতে পারতাম না বিয়াইন, গলার অরকলও না। তয় খাড়ু না দিয়া পায়ের ঝুন্‌ঝুনি্ দিমু বউরে, ছোড বউ আমার আঁটব ঝুন্‌ঝুন্ কইর‍্যা!

জয়গুন ভাবছিল অনেক কিছু। সে নিজের ছেলেরও বিয়ে দেবে—বউ আসবে ঘরে। মেয়ের বিয়ে দেবে—পরের বাড়ী যাবে সে। লালুর মা-র শেষ কথায় সে একটু হাসে।

—হে অইলে শাওন মাসের পয়লা দিয়া অই বিয়া অইব। কি কও বিয়াইন?

গেদির মা একটু চিন্তা করে বলে—ওহোঁ, শাওন মাস আমার মাইয়ার জন্ম মাস।

—হে অইলে পরের মাসে?

—পরের মাসে? না, না। ভাদ্দর মাসে বিলাই পার করে না ঘরতন। আর আমি বুঝিন্ মাইয়া পার করমু? কী যে তোমার আক্কল!

—সত্য অইত। আমার মনেই আছিল্‌না ভাদ্দর মাস। হে অইলে পরের মাসেই অইব, কেমুন গো?

গেদির মা রাজী হয়।

একটা ছেলে সুর করে বলে যাচ্ছে—

খেয়ে যান মজার নাশ্‌তা,
নিয়ে যান সস্তা সস্তা,
এক আনায় দুই বস্তা।

ছেলেটার ছড়া বলার ভঙ্গী আর বস্তার বিরাটত্ব দেখে যাত্রীরা সব হো হো করে হেসে ওঠে। কেউ কেউ দু'একটা প্যাকেট কিনে চানাচুরের মজাটাও পরখ করে। লালুর মা দুই পয়সা দিয়ে একটা প্যাকেট কিনে ভাবী বউকে দেয়। গেদি খুশী হয়।

একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গাড়ী একটা স্টেশনে থামতেই জয়গুন, লালুর মা ও গেদির মা নেমে পড়ে। ময়লা কাপড়ে ভিখারী ভেবে টিকেট কালেক্টার এদের দেখেও দেখে না। এখান থেকে বাজার কিছু দূরে, প্রায় এক মাইল। লালুর মা তার বউকে কোলে করে নিয়ে বেয়ানকে সাহায্য করে।

বাজারে এসে তিনজনে তিন রকমের চাল কেনে তারা। কিন্তু একই দরের টাকায় আড়াই সের করে।

তারপর বাজার থেকে বেরিয়ে তারা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। ফিরে যাওয়ার গাড়ী আবার বিকেল চারটায়।

গাড়ীর সময় আন্দাজ করে তারা ওঠে। পথ দেবার আগে তিনটা ঝুলির চাল মিশিয়ে ছয়টা ঝুলির মধ্যে ভরে। ঝুলিতে এক রকমের অনেক চাল দেখলে রেল-বাবুরা সন্দেহ করে, টিকেট চায়। এরকম করে মিশিয়ে ভিক্ষার চাল বলে চালিয়ে দেয় তারা। টিকেটও লাগে না।

গেদিকে স্টেশনের বাইরে তিনটা ঝুলির পাহারায় রেখে তারা তিন-জন তিনটা ঝুলি হাতে স্টেশনে আসে। কিন্তু সদর দরজা দিয়ে নয়, রেলের লাইন ধরে ধরে। টিকেট কলেক্টারকে এড়িয়েই যেতে চায় সব সময়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও বাকী তিনটে ঝুলি নিয়ে আস্‌বার সময় প্লাটফরমে রেল-পুলিশ আটকায়। বলে—দেখি, দেখি।

সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। লালুর মা বলে—ভিক্‌কার চাইল।

সেপাই চাল দেখে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে—ভিক্ষার চাওয়াল

এতনা ! হামি কুছ্ বোঝে না। চল্ থানামে। জান্‌তি নেহি এক জিল্লাকা চাওয়াল দুসরা জিল্লামে যানে হুকুম নেহি আছে ?

লালুর মা সাহসী। বলে—ছাইড়্যা গ্যাও, সিপাইজী।

সেপাই বলে—তব্ আয় হামার ছঙ্গে।

প্লাটফরম্ থেকে দূরে গিয়ে সেপাই প্যাণ্টের বিরাট পকেট খুলে ধরে। বলে—দে হামার পাকিট ভর্ দে। রেশন মে চাওয়াল মিল্‌তে আছে না, খালি খুদি।

লালুর মা তিনটা ঝুলির থেকে মুঠ ভরে আধ-সের খানেক চাল সেপাইর দুই পকেটে ঢেলে দেয়। সেপাই এবার ছেড়ে দেয়।

জয়গুন পরিশ্রান্ত, ট্রেনের দুলানিতে ঝিমটি আসে। কাঠের সাথে মাথা ঠেকিয়ে সে ঘুমিয়েই পড়ে। গাড়ী গেণ্ডারিয়া স্টেশন ছাড়লে গেদির মা-র ধাক্কায় তার ঘুম ভাঙে।

তাড়াতাড়ি তারা ঝুলিগুলোর মুখ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। ট্রেনের হুইস্‌ল বাজে। ফতুল্লা স্টেশনে এসে যাবে এক্ষুনি। তারা ঝুলি হাতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়। হাসু কোষাটা পানির থেকে তুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ধারিত স্থানে কুল গাছটার কাছে গাড়ী আসতেই তারা সব কটি ঝুলি জানালা দিয়ে দুপ-দাপ বাইরে ফেলে দেয়।

ফতুল্লা স্টেশনে নেমে তারা কুলগাছ তলায় আসে। হাসু ঝুলি-গুলো কুড়িয়ে জড়ো করেছে এক জায়গায়। মাকে দেখে বলে—আইজ গাড়ী বড় দেরী করল মা। রেইল ঘুরে যায় যায় এমুন সময় আমি আইছি।

—কই আর এমন দেরী।

জয়গুন ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে সময় টের পায়নি। আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

—কি দর আন্‌লা মা চাউল ?

—আড়াই সের ভাও। কিন্তুক দর যেন্ চড়া চড়া ঠেক্‌লরে। তুই কত পা'লি, বা'জান ?

—বার আনা। আমি কুন্ত দুই পয়সার চিনা বাদাম খাইছি, মা। এই কয়ডা আনছি মায়মুনের লেইগ্যা।

জয়গুনের মন প্রসন্ন হয় ছেলের ওপর। সে বলে—জলদি কইর‍্যা চল্ যাই।

পাঁচ

বয়সের সাথে সাথে মানুষের মেজাজ পরিবর্তন হয়। পয়তাল্লিশ বছর বয়সে করিমবক্‌শের মেজাজ ঠাণ্ডা না হলেও কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে বৈকি। তা না হলে তার সড়কির হাতল ঘুনে ধরতে পায় ? চার বছর বোধ হয় লাঠিটায়ও তেল মাজা হয় নি। তেলের দামও বেড়েছে, আর লাঠির দরকারটাও কমেছে অনেক। মাটির ওপর পুরানো লাঠিটা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে তার নিজের ও লাঠির বিগত শৌর্যের কথা মনে পড়ে। পেতলে মুঠি-বাঁধা এই লাঠিটা যৌবন-কাল থেকেই তার পথ-চলার সাথী। কারণ মেজাজের জন্য শত্রু কম ছিল না তার। তাই বুড়োর মত লাঠি হাতে সে চল্‌ত। এমন কি ঘুমোবার সময় পাশেই থাক্‌ত লাঠিটা। লাঠিটা হাতে নিলেই তার একদিনের কথা মনে পড়ে।

—দুপুর রাত্রে যাত্রা-গান শুনে এসেছিল সে। মেহেরনের দরজা খুলে দিতে দেরী হয়েছিল। তাকে হাতের এই লাঠিটা দিয়েই সে মেরেছিল। গর্ভবতী মেহেরন সে আঘাত সহ্য করতে পারেনি। তারপর গলায় রশি বেঁধে গাব গাছে লট্‌কিয়ে সে রেহাই পেয়েছিল। হাজার খানেক টাকা অবশ্য খরচ করতে হয়েছিল এ ব্যাপারে।

তার আরো মনে হয় আজকাল—লাঠিটা হয়ত হাশরের দিন তার বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেবে খোদার্ কাছে।

মেহেরন করিমবক্শের প্রথম স্ত্রী।

তারপর সে জয়গুনকে বিয়ে করে। তার ওপরও তার বাহুবলের কসরত চলে ছয় বছর। তার শরীরের কোনো অঙ্গ বোধ হয় তার প্রহারের কাছে রেহাই পায় নি।

জয়গুনের শ্বাশুড়ী সান্ত্বনা দিত—ওয়াতে কি অইছে বউ। মরদ্গুণে যেই পিডে মারব হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মারব বেবাক বিস্তে যাইব। তুই বুঝিন্ কাডুরিয়ার বউর কিচ্ছা হোনস্ নাই? তয় হোন্ঃ রসুল-করিম একদিন বিবি ফাতেমারে কইল—"অমুক জা'গায় এক কাডুরিয়া থাকে। তার বউ আট বিস্তের বড় বিস্তে যাইব।" বিবি ফাতেমা জিগাইল—"ক্যান্ যাইব?" রছুল-করিম কইল-"যাও, গিয়া দেইখ্যা আহ একদিন।" বিবি ফাতেমা কাডুরিয়ার বাড়ী গিয়া ছাহে কি, ওমা! ঘরের দুয়ারে হাজাইয়া থুইছে দাও, লাডি, ঠ্যাঙ্গা, দড়ি। বিবি ফাতেমা কাডুরিয়ার বউরে জিগাইল—"অত লাডি, ঠ্যাঙ্গা এমুন কইর্যা রাখ্ছে কে?" সে জ'ব দিল-"আমি।" জিগাইল—"ক্যাঁ?" জ'ব দিল—"যদি সোয়ামীর খেজমতে তিরুডি অয়, তয় এই লাডি দিয়া আমারে পিডাইব। কামের সময় কোথায় লাডি বিচ্রাইব? এই এর লেইগ্যা আতের কাছে আইন্যা রাখ্ছি।" জিগাইল, "দাও রাখছ ক্যাঁ?" জব দিল—"যদি মনে লয়, কাট্‌ব।"

—ছাখ্ কেমুন জননা আছিল্। জয়গুনের শ্বাশুড়ী মাথা নাড়ে।

জয়গুন এ কেচ্ছা বহু আগেই শুনেছে। মুসলমান ঘরের বউ এ কেচ্ছা শোনেনি, এটা অস্বাভাবিক।

জয়গুন হয়ত সহ্য করত। কিন্তু করিমবক্শ তাকে সে সুযোগ দেয়নি।

বছর দুই আগে করিমবক্শ আবার বিয়ে করেছে। তবে আঞ্জুমনের কপাল ভালো। আগের সে মেজাজ আর নেই। বিশেষ করে পয়লা ঘরের ছেলে রহিমবক্শ বাপের অত্যাচারে শ্বশুর বাড়ী উঠে যাওয়ার পর তার মেজাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বাহুবল যত কমেছে, বাক্যবল তত নয়। তাই ঝগড়া আর প্যান্‌প্যানিটাই আজকাল আছে। প্রতিপক্ষ ঝগ্‌ড়ায় পিছ-পাও নয় বলে খেতে বস্‌তে ঝগড়া হয়। দিন বড় বাদ যায় না। যেদিন বাদ যায়, সেদিন পাড়ার সবাই সচকিত হয়। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে—করিমবক্শ বুঝিন্ বাড়ীত নাই আইজ?

সেদিন আঞ্জুমন এক বেদেনীর কাছ থেকে মেয়ের অসুখের জন্যে কিসের তাবিজ রাখ্‌ছিল। করিমবক্শ হাট থেকে এসে দেখেই আগুন। জিজ্ঞেস করে—কিয়ের তাবিজ, অ্যা? আমারে টোনা করবি নি?

তার এই এক অকারণ সন্দেহ।

আঞ্জুমন রেগে যায়, বলে—হ টোনা করমু। ভেড়া বানাইয়া রাখমু তোমারে।

—হারামী! বৈতাল মাগী! বলে সে উঁচু করে পুরানো লাঠিটা।

—আত উডাইও না কইতে আছি। খইয়া পড়ব আত। কুড়-কুষ্ঠ অইব।

করিমবক্শ লাঠিটা নামায়। তারপর বলে—জয়গুন ত তোর মতন আছিল্ না। মাইর‍্যা চ্যাব্‌ডা কইর‍্যা ফেলাইলেও উঁহু করত না। আর তোর গায়ে ফুলের টোকা না দিতেই—

জয়গুনকে ছেড়ে দেবার পর কাসুকে নিয়ে করিমবক্শ বিব্রত হয়েছিল।

একদিন করিমবক্‌শের এক নিঃসন্তান বোন এসে কাসুকে নিয়ে যাওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

কাসু ফুফুর বাড়ীতে এক রকম ভালোই ছিল।

কিছুদিন আগে ফুফু মারা যাওয়ার পর করিমবক্‌শ তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ বাড়ীর ঝগড়াটে আবহাওয়ায় এসে কয়েক দিনেই সে মন-মরা হয়ে গেছে। এখানে আদর করে কেউ কোলে নেয় না তাকে। ডাকেও না কেউ। এখানে কারো মুখেই হাসি নেই। তাই ওর নিজের হাসিও কোথায় মিলিয়ে গেছে। কারো মুখের দিকে চেয়েই সে ভরসা পায় না। শুধু একজনকেই তার পছন্দ হয়েছে। সে হাসু। তার এখানে আসার পর সে তিন দিন এসেছে। কিছুদিন ধরে তারও দেখা নেই।

হাসুর দেওয়া কদমা করিমবক্‌শ পানিতে ফেলে দিয়েছিল। চরকিটা ভেঙে দিয়েছিল পায়ের তলায় ফেলে। কাসুকেও থাপড় মেরেছিল পিঠের ওপর। ঐ দিন থেকেই কাসু আরো মুষড়ে পড়ে। করিমবক্‌শ সেদিন একটা মাটির ঘোড়া কিনে দিয়েছিল। কাসু তা ছোঁয় নি।

হাসু আর আস্‌বে না, তার ছোট মনেই সে অনুমান করেছিল সেদিন। হাসুর আশায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

করিমবক্‌শ ঐ দিন থেকেই হুঁসিয়ার হয়েছে। হাসুকে তার সন্দেহ হয়। ছোঁড়াটা ভারী ফেরেববাজ। ফুস্‌লি দিয়ে কাসুকে নিয়ে যেতে পারে। তাই, সে যেখানে যায়, প্রায় সাথে-সাথেই রাখে কাসুকে। বড় ছেলেটা শ্বশুর বাড়ী পালিয়েছে। কাসুই এখন একমাত্র ভরসা।

খেত-পাথারে জোয়ারের পানি আসার সাথে-সাথে করিমবক্‌শের মনে আসে এক জোয়ার। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সে কোচ নিয়ে ঘুরে

বেড়ায় মাঠে মাঠে। তার ঐ এক ঝোঁক। তার যৌবনের হিংস্র স্বভাবের অবশিষ্ট এই মাছ-শিকার। কয়েকদিনের চেষ্টাও অনেক সময় বিফলে যায়। তবু তার ধৈর্যের অভাব নেই। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে সে ধান-খেতের ভেতর মাছের সন্ধান করে বেড়ায়।

এ বছর তার সুবিধা হয়েছে আরো। আউস ধান পেয়েছে মন পাঁচেক। এ ধানে প্রায় আমন ধর ধর হবে। কারণ ছেলে ও ছেলে-বৌ চলে যাওয়ায় খাবার লোক কমেছে। গাই দুই সের দুধ দেয়। আট আনা করে রোজ এক টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং তার আর ভাবনা নেই। সারাদিনে সে শুধু বাজারে গিয়ে দুধ বেচে। কাজ আরো আছে বটে। কিন্তু মাছ ধরার নেশায় সে-সব কাজের খেয়ালই হয় না। বড় ছেলে থাকৃতে সব কাজ সেই করত।

তিনদিন অবিরাম বৃষ্টিপাতের পর আজ দুপুরের দিকে রোদ উঠেছে। ভাত খাওয়ার পর করিমবক্শ ডাকে—ফুলির মা, এক ছিলিম তামাক দ্যাও দেহি জল্‌দি। বাতাসের রাগ নাই আইজ। মাছ দ্যাখ্‌তে সুবিধা অইব।

আঞ্জুমন কল্কেতে আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আসে। করিমবক্শের হাতের হুঁকোটায় কল্কেটা বসিয়ে দিয়ে বলে—আর ত কাম নাই তোমার। পাড়ের জাগ্‌ড়া দ্যাখ্‌ছ?

—হু, দেখমু হনে আইজ। নিরাগ বাতাসে আইজ চকে যা মাছ দ্যাহা যাইব!

—বাট্‌না বাইট্যা রাখমু হেঅইলে, কি কও?

করিমবক্শ খোঁচাটা নীরবে সহ্য করে। মাছ সে চার-পাঁচ দিনেও একটা পায় নাই। তাই এ টিট্‌কারী।

কোচ ও যুতি হাতে সে নৌকায় ওঠে। পাশের বাড়ীর হারুণকে ডেকে নেয় নৌকা বাইতে। কাসুকেও রেখে যায় না বাড়ীতে।

এদিকের পানি কালো, তাই স্বচ্ছ। মাছ মারতে অসুবিধা। শিকারী মাছ দেখবার আগেই মাছ শিকারীকে দেখতে পেয়ে পালায়।

দাড়া-পথ বেয়ে তারা খালের ধারের একটা ধান-খেতে ওঠে। নদীর পানি খাল দিয়ে এসে এখানকার পানি ঘোলা করে রাখে।

করিমবক্‌শ নিশ্চুপে ওত পেতে থাকে। চারদিকে চোখ বুলায় একটা ধান গাছ নড়ে কিনা। কখনও কোচ নিয়ে কখনও যুত হাতে নিয়ে সে তাগ্ করে।

মাছের কোন লক্ষণ না পেয়ে হাতের ইসারায় সে আর এক খেতের দিকে নৌকা চালাবার নির্দেশ দেয়।

এক জায়গায় কয়েকটা ধান গাছ নড়ে ওঠে। আর যায় কোথা! ঝরর্‌র্-ঝপ্। কোচ দিয়ে কোপ দেয় করিমবক্‌শ।

আরো অনেক লোক জমা হয়েছিল মাছ মারতে। একজন বলে—আইজ আর মিয়াবাই খালি আতে যাইব না, বোঝতে পারছি।

করিমবক্‌শ কোচটা তুলে নিরাশ হয়। বলে—দুশ্ শালা। আইজ যাত্রাডাই খারাপ। আর কেঅর কোচের নীচে পড়তে পারলিনা? আমারডার নীচেই—

— কি মিয়া, কাছিম নাকি? একজন জিজ্ঞেস করে।

—আর কইওনা মিয়া। আইজ যাত্রাডাই খারাপ।

—যাত্রা খারাপ! ক্যঁা? বউর মোখ দেইক্যা যাত্রা কর নাই মিয়া?

হারুণ ও কাসু দুজনেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। হারুণ নিজের মাথা থেকে মাথলাটা কাসুকে দিয়ে বলে—ঘাম দিছেরে, ইস্! মাথলাডা মাথায় দে, রউদ লাগব না।

আরো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে যখন আর মাছের সাড়া পাওয়া যায় না, তখন করিমবক্‌শ বলে—কি জানি এইর'ম অইতাছে ক্যান্। তোরা কাপড় উল্ডা কইর‍্যা পিন্দা নে দেহি কি অয়।

করিমবক্‌শ নিজেও গামছা প'রে লুঙ্গি ছাড়ে। লুঙ্গির দিক পাল্‌টিয়ে নিয়ে আবার পরে।

এবার করিমবক্‌শ এক চাক গজার মাছের পোনার পেছনে লাগে। কিন্তু গজারটা খুবই চালাক। পোনার কাছাকাছিও ঘেষে না। মাছটা বড়ই হবে খুব, করিমবক্‌শ অনুমান করতে পারে। পোনাগুলিও বড় হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে পরে একসঙ্গে ভেসে ওঠে। এক জায়গায় থাকলেও কথা ছিল। এই এখানে দেখা যায়, তারপর আর নেই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? করিমবক্‌শ এদিক-ওদিক তাকায়। কিছুক্ষণ পরে ভুস্‌ করে ভেসে ওঠে। করিমবক্‌শ মুখে কিছু না ব'লে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। হারুণ আস্তে আস্তে অনুসরণ করে।

পোনাগুলি খেতের পর খেত পার হয়ে চলেছে। ঘোলাপানি ছেড়ে আসে কালো পানিতে। করিমবক্‌শ তবু হাল ছাড়ে না।

এবার একটা জলা খেত পার হয়ে পোনাগুলি ধান খেতে ঢোকে। করিমবক্‌শ কোচটা রেখে যুতি হাতে নিয়ে আবার মনোযোগ দেয়। পেছনে হাত দেখিয়ে নৌকার গতি মন্থর করার নির্দেশ দেয়। নিজেও সে নুয়ে এক হাতে ধানগাছের গোছা ধরে নৌকার গতিরোধ করে।

—কাসু!

হাসুর ডাক। করিমবক্‌শ চমকে ওঠে। চেয়ে দেখে সে জয়গুনের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে।

জয়গুন, মায়মুন ও হাসু দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এদিকে। জয়গুন এখন গাছের আড়ালে চলে গেছে।

কাসু ডাক শুনে দাঁড়িয়েছিল। করিমবক্‌শ বলে—ব' হারামজাদা! বইসা পড়। পইড়্যা যাবি।

তারপর হারুণের কাছ থেকে লগি নিয়ে জোর ঠেলায় সে নৌকা ছুটায় বাড়ীর দিকে।

জয়গুন চেয়ে থাকে যতক্ষণ নৌকাটা দেখা যায়। কাসুকে তিন বছরের রেখে সে এসেছিল। এখন সে বড় হয়েছে। কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু দূর থেকে তার মুখখানা আদৌ দেখা গেল না। চার বছর আগের কাসুর সেই মুখখানা আবছা হয়ে গেছে তার মনে। এখন বড় হয়ে সে মুখখানা কেমন হয়েছে শত চেষ্টা করেও মনে মনে তা গড়তে পারে না।

ছয়

১৫ই আগস্ট, শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল।

হাসু মা-কে মোড়লপাড়ায় নামিয়ে দিয়ে রেলরাস্তার পাশে আসে। রোজ সেখানে কোষা ডুবিয়ে রেখে সে কাজে যায়।

রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চীৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত!

রেল-রাস্তা ধরে সে ভয়ে ভয়ে পা ফেলে। মারামারি বাধ্‌লে কোন কাজই হবে না আজ। গত বছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারে নি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।

একটা গাড়ী আস্‌ছে নারায়নগঞ্জ থেকে। ইঞ্জিনের সামনে একটা নিশান পত্‌ পত্‌ করছে বাতাসে। সবুজ রঙের বড় নিশান। মাঝে চাঁদ ও তারা।

গাড়ীর মাঝেও চীৎকার। চারদিকের চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠছে। গাড়ীটা কাছাকাছি আস্‌তে স্পষ্ট বোঝা যায়—

আজাদ পাকিস্তান—জিন্দাবাদ!

কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ!

হাসুর গা রোমাঞ্চিত হয় আনন্দে। সে চেয়ে থাকে। গাড়ীর

প্রত্যেকটি লোক আনন্দ-চঞ্চল। অনেকের হাতেই নিশান। বাইরে মুখ বাড়িয়ে নিশান নেড়ে তারা চীৎকার করছে। প্রত্যেক কামরায় ঐ একই আওয়াজ।

হাসুও হাত উঁচিয়ে, গলা ফাটিয়ে আওয়াজ তোলে ঐ সাথে।

মানুষের বিরাট মিছিল চলছে শহরের রাস্তা দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান, ছেলে-বুড়ো—সবাই আছে মিছিলে।

হাসু দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিছিল সে বহু দেখেছে। কিন্তু এরকম আর দেখেনি। একজন লোক কাগজের একটা নিশান ওর হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় লাইনে। হাসু মিছিলের সাথে মিশে যায়। কাজের কথা তার মনেই হয় না।

মিছিল শহরের সমস্ত রাস্তা ঘোরে। চীৎকার ক'রে জানায় স্বাধীনতার বার্তা।

মিছিল ভাঙে দেড়টায়। হাসু তাড়াতাড়ি স্টেশনে আসে। মেল স্টীমার এখনও আসেনি। হাসুর ভাগ্য ভালো। আর দিন আসে একটার মধ্যেই।

তিনটার সময় মেল আসে। জাহাজের সামনে ঠিক ছাতের ওপর উড়ছে সবুজ নিশান। জাহাজের ডেকে লোক ঠাঁসাঠাঁসি হয়ে আছে। ছাতেও উঠেছে অনেক লোক, সেখান থেকে আওয়াজ ওঠে —

পাকিস্তান—জিন্দাবাদ!

কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ!

পারের থেকে একদল তাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে। জাহাজখানা যেন কেঁপে ওঠে। সমস্ত মিলে একটা নতুন অনুভূতির সঞ্চার হয় হাসুর মনে।

দুটো মোট বয়ে আজ দশ আনা পায় হাসু। অন্য দিন দর কষাকষি হয়। তিন আনা, বড় জোর চার আনার বেশী মোট পিছু দিতে চায় না। কিন্তু আজ আর পয়সার দিকে যেন খেয়াল নেই কারো।

আজ আর কাজ করবে না হাসু।

পথে আস্‌তে আস্‌তে সে দেখে, শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে নিশান উড়ছে বড় বড়। সে তার হাতের কাগজের নিশানটার দিকে চায়, আবার চায় দুই পাশে। ডানে হিন্দু পাড়া, বাঁয়ে মুসলমান পাড়া। সব বাড়ীতেই আজ সবুজ নিশান।

হাসু বাড়ী আসে। চীৎকার ক'রে সে গলা ভেঙেছে আজ। ভাঙা গলায় সে সমস্ত দিনের কথা বলে যায় মা-র কাছে। জয়গুন হাসুর হাত থেকে নিশানটা নিয়ে দেখে আর শুনে যায় হাসুর কথা এক মনে।

হাসু বলে—আর আমাগ কষ্ট অইব না, কেমুন গো মা? মাইন্‌ষে কওয়া-কওয়ি করতে আছে ঘাডে-পথে। দ্যাশ স্বাদীন অইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মাইন্‌ষের আর দুখ্‌খু থাক্‌ব না।

—হুঁ। জয়গুন সায় দেয়। সে-ও সেদিন গাড়ীতে শুনেছে, দেশ স্বাধীন হবে। ভাত-কাপড় সস্তা হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না।

জয়গুনের সুখের স্বপ্ন আজ সফল হ'ল। সত্যি সত্যি স্বাধীনতা এলো আজ।

হাসু বলে—টাউনে আইজ বেবাক বাড়ীত্‌ নিশান ওড়্‌তে আছে, মা। কি সোন্দর, বড় বড় নিশান! তুমি একটা বানাইয়া দ্যাও না।

জয়গুন হাতের নিশানটা দেখিয়ে বলে—এই যে আছে একটা। আর দিয়া কি অইব?

—এইডা যে এক্কেরেই ছোড। গাছের ডাইলে বাইন্দা উপরে তুল্‌তাম, মা। গেরামের বেবাক মাইনষে দ্যাখতে পাইব। টাউনে কত বড় বড় নিশান উড়তে আছে আইজ!

জয়গুন ঘরে যায়। একটা গাঁট্‌রি নামায় মাচার ওপর থেকে। লাল কাপড়ের একটা টুক্‌রো বের ক'রে হাসুকে দেখায়।

—উঁহু, রাঙ্গায় অইব না, মা। এই রহম কচুয়া অওয়ন চাই। হাতের নিশানটা দেখিয়ে প্রতিবাদ করে হাসু।

—ক্যা? রাঙ্গায় দোষ কি? কী সোন্দর খুনী রঙ! মীরপুরের শাহ্ সা'বের দরগায় দেইক্যা আইলাম লাল নিশান।

—টাউনের এক বাড়ীত রাঙ্গা নিশান ছ্যাখলাম না। বেবাক এই রহম কচুয়া।

—আসমানী রঙ্গে অইব?

—উহুঁ, কইলাম যে এই রঙ।

—তোর লেইগ্যা এই রঙ বানাইলে পারি অহন? জয়গুন রাগ করে। সে আর একটা গাঁট্‌রির জন্যে উঠতেই হাসু খুশী হয়।

গাঁট্‌রি খোলে জয়গুন। পুরাতন কাপড়ের গাঁট্‌রি। কালি-ঝুলি মেখে বিশ্রী হয়ে গেছে গাঁট্‌রিটা। খুল্‌তে খুল্‌তে তার হাত অবশ হয়ে আসে। বুকের ভেতর স্পন্দন বেড়ে যায় অসম্ভব রকম। জীর্ণ, পুরাতন কাপড়। ভাঁজ করে করে সাজান। জয়গুনের বিগত জীবনের অনেক কাহিনী কাপড়গুলোর মধ্যে পুঞ্জীভূত। ভাঁজ খুল্‌তে খুল্‌তে তার স্মৃতির ভাঁজও খুলে যায়। এই টুপিটা তার প্রথম স্বামীর—হাসুর বাপের। ঢোলা পাঞ্জাবীটাও তার। জয়গুনের চোখে ভাসে কিস্তী-টুপি মাথায়, পাঞ্জাবী গায়ে জব্বর মুন্‌শীর চেহারাখানা।...এই বোম্বাই শাড়ীটা তার প্রথম বিয়ের। ঘোমটা-টানা বধূ-জীবনের সুমধুর স্মৃতি এখন শুধু ব্যথাই দেয়।...এই ছোট্ট জামাটা কাসুর। এই জামা আর কান-টুপিটা ছোট খুকীর।...

জয়গুনের চোখ আর বাঁধ মানে না। চোখের পানিতে গাঁট্‌রির কাপড়গুলো ভিজে ওঠে।

ছোট খুকী!

তখন দুর্ভিক্ষ সবে দেখা দিয়েছে। দুর্নামের ভয়ে স্বামী-পরিত্যক্তা

জয়গুন তখনও ঘরের বার হয় নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না পেয়ে শুকনো পাটখড়ির মত হয়েছিল; শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল। তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি। ঐ বোম্বাই শাড়ীটার অর্ধেক দিয়ে কাফন পরিয়ে তাকে যখন কবরে নামান হয়, তখন জয়গুন বিলাপ করতে করতে বলেছিল—আইজ তোরে বউ সাজাইয়া দিলাম।

জয়গুন আর ভাবতে পারে না। একমাত্র সবুজ বোম্বাই শাড়ীটার অবশিষ্ট পাট্‌টা হাসুর দিকে ছুড়ে দিয়ে সে কাপড়গুলোর মধ্যে মুখ লুকায়।

হাসু ও মায়মুন অবাক হয়ে চেয়ে ছিল মা-র দিকে। তারা কিছু বুঝতে না পেরে শাড়ীর পাট্‌টা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মায়মুন সুঁই নিয়ে আসে। সাদা কাপড়ের চাঁদ ও তারা কেটে নিশানের মাঝে জুড়ে দেয়।

বেশ সুন্দর নিশান হয়েছে। ঠিক সায়েব বাড়ীর নিশানটার মত। মায়মুন উৎফুল্ল হয়। হাসুর চোখে-মুখে হাসি ফোটে।

জয়গুন যখন বাইরে আসে তখন হাসু আমগাছে উঠে নিশানটা বেঁধে দিয়েছে। মায়মুন ও শফী চেয়ে আছে ওপর দিকে। গাছের ওপর থেকে হাসু ডাকে—মায়মুন! শফী! আমি যা কই, আমার লগে লগে আওয়াজ করবি, কেমুন?

শফী বলে—কি কইমু?

পাকিস্তান—জিন্দাবাদ!

হাসুর সাথে গলা মিলিয়ে শফী ও মায়মুন আওয়াজ তোলে। জয়গুনের মনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে কথাগুলো।

জয়গুন নিশানটার দিকে তাকায়। সবুজ নিশান নতুন জীবনের আভাস দিয়ে যায়। মনে জাগে বাঁচবার আশা।

সাত

চারদিকে আনন্দ কোলাহল। মায়মুন ডাকে—মা, চান ওঠছে বুঝিন, ঈদের চান।

মায়মুন দৌড়ে যায় বাড়ীর পশ্চিম দিকে। শফী এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। পশ্চিম দিগন্তের রঙ্গীন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ওরা তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে। জয়গুনও এসে যোগ দেয়।

মায়মুন বলে—কই মা ? দেহা যায় না দেহি।

—অই সাঁঝুয়া তারাডার কাছ দিয়া ছাখ। ওডার নীচে দিয়াই ছাহা যায় হগল বচ্ছর।

—অ-ই, ঐ যে, ছাহা গেছে, ঐ-ঐ-ঐ। শফী লাফিয়ে ওঠে আনন্দে, মায়মুনকে টেনে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়—ঐ যে তারাডার একটু নীচে। কালা মেঘডার পাশে।

মায়মুন দেখতে পেয়ে আনন্দে হাত তালি দেয়। জয়গুন এখনও দেখতে পায় নি। সে বলে—আমাগ কি হেই দিন আছে! তোগ নতুন চউখ। তোরা ছাখতে পাবি।

—তুমি অহনও ছাহ নাই মা ? মায়মুন এবার মা-কে দেখাতে চেষ্টা করে। জয়গুন দেখতে পায় অনেক পরে। ভক্তিতে সে মাথা নোয়ায়, দুই হাত তুলে মোনাজাত পড়ে।

—এক্কেরে কাচির মতন চিক্কণ এইবারের চান। সিদা অইয়া ওঠছে। আর হগল বচ্ছরের মতন কাইত অইয়া ওডে নাই। মোনাজাত সেরে বলে জয়গুন।

চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে গেলে জয়গুন আবার বলে—চল্, ইফতার খুলি গিয়া।

শফীর মা-র ঘরের কাছে যেতে সে ডাকে—চান্ দেখলিনি, হাসুর মা ?

—হ বইন্। দ্যাখলাম। বড় ছোড এই বারের চান।

—তোরাই দ্যাখ বইন, তোগ চউখ দিছে খোদায়। আমার একটা চউখ, হেইডাও বুঝিন্ বুইজ্যা গেল।

শফীর মা নিশ্বাস ছাড়ে। এমনি-ই সে লবেজান। তার ওপর রোজা রেখে সে বিকালের দিকে খুবই কাহিল হয়ে যায়। সে আবার বলে—চাইর পাঁচদিন পরে ছাড়া আমি দ্যাখতে পারমু না। চানডা সিয়ানা অউক। আ-গো হাসুয়ার মা, এইবার কোন্ মুখী কাইত অইয়া ওঠছে গো? দহিন মুখী?

—এইবার সোজাসুজিই ওঠছে, বইন। ব্যাকা-ত্যাড়া ওডে নাই। লক্ষণ ভালা, না?

—হ বইন, আর আকাল অইব না এইবার, দেহিস্। যা কইলাম যদি না ফলে তহন কইস, কানা বুড়ী কি কইছিল।

শফীর মা-র কুচকে যাওয়া শুকনো কালো মুখখানা খুশীতে ভরে ওঠে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সে-মুখখানা দেখে জয়গুনেরও ভরসা হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর মতই বিশ্বাস করে শফীর মার কথাগুলো।

শফীর মা বলে—হেই বচ্ছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুখী কাইত অইয়া উঠছিল। আমি নিজে দেক্ছি। চউখ তখন তাজা আছিল্। আমি দেইক্যা কইছিলাম তখন—এইবার না জানি কি আছে কপালে!

—দক্ষিণ মুখী কাইত অইয়া ওঠলে আকাল অইব-ই। বুড়া-বুড়ীর কাছে হুনছি, দক্ষিণ মুখী কাইত অইয়া চান যদি সমুদ্দুরের উপরে নজর দেয়, তয় বান ডাইক্যা দ্যাশ-দুইন্নাই তলাইয়া যায়। দেখলি না অ-ই বচ্ছর কেমুন—

—কত বচ্ছর পর এইবার সিধা ওঠছে চান। খোদা বাঁচানে'য়ালা।

এফতারের সময় উৎরে গেছে। জয়গুন ঘরের দিকে পা দেয়।

মায়মুন বলে—উত্তর মুখী কাইত অইয়া ওঠলে কি অয়, মা?

—মড়ক লাগে। কলড়া-বসন্ত অয়। ম.নুষ মইর‍্যা সাফ অইয়া যায়।

মায়মুন শিউরে উঠে।

ওজু ক'রে জয়গুন ঘরে যায়। শেষ রোজার এফতারের জন্য আজ একটু আলাদা আয়োজন—চার ফালি শশা ও এক খোরা গুড়ের শর-বত। আর সব দিন এক মগ সাদা পানি সামনে ক'রে সে বসে থাকৃত বেলা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। এমন ক'রে খাবার সামনে নিয়ে এফতারের জন্য বসে থাকা অনেক পুণ্যের কাজ, সে জানে। মসৃজিদের আজান এফতারের সঙ্কেত জানালে সে এক ঢোক পানি খেয়ে রোজা ভাঙত।

জয়গুন এক চুমুক শরবত খেয়ে মায়মুনের সামনে ঠেলে দেয় বাটিটা। মায়মুন বাটিটা নিয়ে চুমুক দিতে জয়গুন বলে—

মজা পাইয়া বেবাক খানি খাইয়া ফেলাইস না আবার। তোর মিয়া-ভাইর লেইগ্যা থুইয়া দিস্।

শশার এক ফালি মায়মুনের হাতে দিয়ে জয়গুন এক ফালি তুলে নেয়। বাকী দুই ফালি রেখে দেয় হাসুর জন্যে।

শশা চিবোতে চিবোতে সে গত কয়েক বছরের কথা মনে করে। পঞ্চাশ সনের পর থেকে সে এরকম পুরো তিরিশ রোজা রাখতে পারেনি। চার বছর পর এবার তিরিশ রোজা পুরিয়ে তার মনে শান্তির অবধি নেই। কিন্তু গত বছরগুলির চিন্তাও তাকে পেয়ে বসে। পঞ্চাশ সনে একটা রোজাও রাখা হয় নি। তার পরের বছর ছয়টা, তার পরে পাঁচটা এবং গত বছর সাতটা রোজা ভাঙা হয়েছে– সে মনে করে রেখেছে। জয়গুন হিসেব ক'রে দেখে, এ কয় বছরে সে দু'কুড়ি আট টা রোজা ভেঙেছে। নামাজ-রোজা সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি তার জানা। প্রথম স্বামী জব্বর মুন্‌শীর দৌলতেই তা সম্ভব হয়েছে। সে জানে, রমজানের একটা রোজা ভাঙলে তার বদলে তিনকুড়ি রোজা রাখতে হয়, তবেই গোনা মাফ হয়।

জয়গুন হিসেব করতে চেষ্টা করে। আগেও সে করেছে কয়েকবার। একটা রোজার জন্য ষাট টা হলে দু'কুড়ি আটটার জন্য কত দিন রোজা রাখতে হয়। সে হিসেব করতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে ফেলে। একশো পর্যন্ত সে ভালোমত গুণতে পারে না। 'এক কুড়ি' 'দুই কুড়ি' করে সে হিসেব করে, সুতরাং সে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তবুও সে আন্দাজ করে নিয়েছে, অনেক বছর, হয়ত বা বাকী জীবনভর রোজা রেখেও সে আট-চল্লিশ দিনের রোজা শোধ করতে পারবে না। সে আরো জানে, একটা রোজার জন্য আশী হোক্‌বা দোজখের আগুনে পুড়তে হবে। এক একটা হোক্‌বা ইহকালের আশী বছরের সমান।

জয়গুনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে নামাজ সেরে তস্‌বীহ নিয়ে বসে। তস্‌বীহ জপা এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তার আবার মনে হয়, কেন? সে-ত জীবনভর রোজা রেখেই চলছে। রোজা ছাড়া আর কি? বারো মাসের একদিনও সে পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত আধপেটা খেয়ে থাকে। পেট ভরে কবে সে শুধু দুটো ভাত খেয়েছে তার মনে পড়েনা। পঞ্চাশ সনের কথা মনে হয়। একটা রোজাও রাখা হয় নি। রোজা রাখার কথা মনেও হয় নি। এক বাটি ফেনের জন্য ছেলে-মেয়েকে নিয়ে কত জায়গায়, কত বাড়ীতে বাড়ীতে তাকে ঘুরতে হয়েছে। এক বাটি খিচুড়ীর জন্য লঙ্গর খানায় লাইন ধরতে হয়েছে। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধ-হাঁটু কাদার মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েছে। মাথার ওপর বৃষ্টি পড়েছে। রোদ জ্বলেছে। তার চেয়ে বেশী জ্বলেছে পেটের মধ্যে। যখন যেখানে যতটুকু পেয়েছে, খেয়েছে। পেট ভরেনি। পানি খেয়ে খেয়ে পেট ভরেছে। তার পরের বছরগুলিও চল্‌ছে অতি কষ্টে। ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে কতদিন উপোস করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সারারাত, সারাদিন কেটেছে, একটা দানাও পড়েনি পেটে। রমজান মাসের

রোজার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর এ রোজা। রমজানের এক মাস দিনের বেলা শুধু উপোস। কিন্তু তার বারোমেসে রোজার যে অন্ত নেই।

কিন্তু তবুও জয়গুনের শান্তি নেই, সান্ত্বনা সে পায় না। তার অন্যায়ের জন্য সে মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করে।

হাসু আসে আটটায়। মোট বয়ে বারো আনা পেয়ে সে চার আনা দিয়ে একটা নারকেল নিয়ে আসে। জয়গুন দেখে রাগ করে—তোর আর আক্কল অইব কোন দিন! অত পয়সার নাইকল কিন্‌তে গেলি ক্যা?

—ঈদের দিন এট্টু শিন্নিও খাইমু না?

—নাইকল বেগর আর শিন্নি অয়না! নোয়াবের পো নোয়াব। নাইকল বেগরই পাকাইমু আমি। অইডা বেইচ্যা ফালাবি কাইল।

হাসু ক্ষুণ্ন হয়। বলে—থাউক, আর শিন্নি রানতে অইব না। পান্তা ভাত আর মরিচ পোড়া খাওয়া কপাল। বচ্ছরের একটা দিন আর শিন্নি খাইয়া কি অইব!

জয়গুন চুপ করে। খানিক পরে আবার বলে—পরাণে খাইতে চায়, খাও। পয়সা কামাই করবা, খাইবা। আমার কি? দুই দিন বাদে যহন শুকাইয়া তেজপাতা অইয়া যাইবা, তহন বোঝবা শিন্নির মজা।

খাওয়ার পরে জয়গুন বাঁশের চোঙাটা নামায়। পয়সা রাখবার একমাত্র আধার এই চোঙাটা। মাটির ওপর ঢালে সমস্ত পয়সা। আনি, দুয়ানি, সিকি আলাদা আলাদা সাজিয়ে হিসেব করে। হাসুর আজকের আট আনা সহ মোট তিন টাকা দশ আনা! চাল্ কিন্‌তে হবে। তেল, মরিচ, আরো অনেক কিছুই নেই। অনেক কিছুর মধ্যে লবণটা না কিন্‌লেই চলে না। লবণ একটু বেশীই লাগে তার সংসারে। পান্তাভাত খেতেই বেশী খরচ হয় লবণ।

হাসু বলে—একটা টুপি কিনার পয়সা দিবা, মা? কাইল ঈদের ময়দানে কি মাথায় দিয়া যাইমু?

—তোর টুপি কিনন্ লাগত না। টুপি একটা দিমু তোরে। তয় কাসুর লেইগ্যা একটা টুপি—

হাসু সম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে বলে—ওর একটা টুপিতে আর কত লাগব। এই বড়জোর পাঁচ আনা ছয় আনা।

মায়মুন একটু এগিয়ে মা-র দিকে চেয়ে ডাকে—মা।

—কি? থাইম্যা গেলি ক্যা? ক।

পরিহিত কাপড়ের একটা ছেঁড়া জায়গা দেখিয়ে মায়মুন বলে—ছ্যাহ মা, কেমুন ছিড়্যা গেছে। ঈদের দিন বেড়াইতে যাইমু না?

মেয়ের আবদার বুঝে রাগ হয় জয়গুনের। সে বলে—কি? কাপোড়?

—হ।

—হ! কাপোড়! কাপোড় দিয়া কবর দিমু তোরে, শয়তান! ধাক্কা দিয়ে মায়মুনকে সরিয়ে ভেঙচিয়ে ওঠে জয়গুন।

হাসু মায়মুনের দিকে তাকায়। ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

মায়মুন তাড়া খেয়ে শুয়ে পড়েছে। জয়গুন ডাকে—হাসুর গামছাডা পিন্দা কাপোড় খুইল্যা দে ময়মন, সিলাইয়া দেই। কাইল রাইত পোয়া ইলে সোডা দিয়া ধুইয়া দিমুহনে।

জয়গুন সুঁই-সূতা নিয়ে বসে। নিজের ও মায়মুনের কাপড়ে জোড়া-তালি লাগায়।

হাসু ও মায়মুন ঘুমিয়ে পড়েছে। মশার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। জয়গুন ওদের মুখে হাত বাড়িয়ে মশা তাড়ায়।

সেলাই সারতে অনেক রাত হয়। রাত্রির নীরবতা ভেঙে হঠাৎ ডাহুক 'কোয়াক কোয়াক' করে ওঠে। চারদিকে পশু-পাখীর ঘুম-কাতর সাড়া পাওয়া যায়। ঘরের হাঁস দুটোও প্যাঁক প্যাঁক করে আবার ঠোঁট লুকায় পালকের মধ্যে। জয়গুন ভাবে—পইখ-পাখড়ার এক ঘুম হয়ে গেল।

জয়গুন কুপিটা নিবিয়ে মায়মুনের পাশ দিয়ে শুয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। অভ্যাস বসে মায়মুনও মা-র গলার উপর একখানা হাত লতিয়ে দেয় ঘুমের ঘোরে। জয়গুনের বুক স্নেহে ভিজে ওঠে। সে ভাবে, এ মেয়েটি কোন দিন তার কাছে আদর পায় না। আবদার করলে কিল-থাপ্পড় খায়। কাপড় তার একখানা। তাও তালি দিয়ে দিয়ে এতদিন চলেছে। কিন্তু কাল ঈদ—বছরের সেরা দিন। এ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করা চলে, কিন্তু কুটুম্ব-বাড়ী যাওয়া চলে না। আর কুটুম্ব আছেই বা কে ? হাসুর চাচা আছে দু'জন। কিন্তু তারা হাসুর মৃত্যু-ই কামনা করে। জব্বর মুন্শীর মৃত্যুর পর তার ভাগের তিন বিঘা জমি আর ঘরখানা পর্যন্ত হাসুর এই চাচা দু'জন জোর করে ভোগ-দখল করছে। এগুলোর আশা জয়গুন ছেড়েই দিয়েছে। হাসু বড় হয়ে যদি কোন দিন আদায় করতে পারে।

জয়গুন আবার ভাবে—হাসু ও মায়মুনের কপালে কুটুম্ব-বাড়ীর এক মুঠো ভাত লেখা নেই।

জয়গুন মায়মুনের চুলের মাঝে হাত দেয়। আঙ্গুলের সাথে জড়িয়ে আসে এক গোছা চুল।

মায়মুন কোন কিছুর জন্য আবদার করলে বা কোন অন্যায় করলে সে চুল ধরে টান মারত। টান্তে টান্তে সে-ই আল্গা করে দিয়েছে চুলগুলি। চুলগুলির জন্য তার মায়া হয়। চুলের মুঠি ধরে টানাটানি না করলে তার চুল এতদিনে হয়ত কোমর অবধি লম্বা হত।

জয়গুন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, মায়মুনকে আর সে মার-ধর করবে না। অন্ততঃ তার চুল ধরে আর সে টানাটানি করবে না। মেয়ে ব'লে মায়মুনকে এতদিন সে অনাদর করেই আসছে। কিন্তু আর না। হাসু কোলের আর মায়মুন পিঠের– তাত নয়। দু'জনকেই সে পেটে ধরেছে। আর মেয়ে হলেও মায়মুন লক্ষী। সে বাইরে গেলে মায়মুনই সব কাজ করে। গায়ে এতটুকু জোর না থাকলেও কোন কাজ সে বড় ফেলে রাখে না।

মায়মুনের জন্য আর কোন দিন জয়গুন এমন করে ভাবে নি। আজ হাসু ও মায়মুন তার চোখে সমান হয়ে গেছে।

অল্প কয়েকটা মাত্র চুল মায়মুনের মাথায়। বাঁদরের লোমের মত লাল। যত্ন ও তেল অভাবে জট পাকিয়ে গেছে। জয়গুন অন্ধকারে মাথা হাতড়ে উকুন মারে। উকুনে গিজগিজ করছে মাথা। রাত্রে রাত্রে এমনি করে মেরে সে কমিয়ে রেখেছে। নয়ত উকুনের আণ্ডা-বাচ্চায় এতদিনে মাথা ছেয়ে যেত। তার নিজের মাথায় উকুন টিকৃতে পারে না। নানা চিন্তা-ভাবনায় মাথা গরম থাকে বলেই বোধ হয়।

অনেক রাত হয়েছে। উকুন বাছতে বাছতে মায়মুনের মাথায় হাত রেখেই জয়গুন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

আট

খুরশীদ মোল্লা গ্রামের ফুড কমিটির সেক্রেটারী। ঈদের দিন ভোর হওয়ার সাথে সাথে তার বৈঠকখানার বাইরে জড় হয় অনেক লোক। কেউ কেউ ভেতরেও আসে।

খুরশীদ মোল্লা একটু দেরীতেই ঘুম ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে চকির উপর এসে বসে। তার মুখে বিরক্তির স্পষ্ট আভাস—সবাই

ধরতে পারে। গ্রামের মোড়ল কাজী খলিল বকৃশ ও গদু প্রধান চকির উপর সেক্রেটারীর পাশ দিয়ে বসে পড়ে।

খুরশীদ বলে—দেখুন ত কি ঝঞ্ঝাট। ভোর না হতেই বাড়ী মাথায় করে তুলছে সব। ঈদের দিন এই উৎপাত কার ভাল লাগে? চিনি এসেছে মাত্র ক'মণ, আর গ্রামে লোক হচ্ছে দু'হাজার। এক তোলা করেও পড়বে না মাথা পিছু।

কাজী খলিল বকৃশ উপস্থিত একজনকে উদ্দেশ করে বলে—কিরে লেদু, চিনি দিয়া কি করবি? তারপর নিজে নিজেই বলে—ভাত জোড়ে না, চিনি খায়। বাহার ব্যাটা! হেই-যে মাইন্‌ষে কইছিল—ঘর নাই, দুয়ার দিয়া শোয়।

লেদু মিয়া টিপ্পনি কাট্‌তে পটু। ভেতরে গরম হয়ে বলে—আমাগ মতন গরীব মাইন্‌ষের আবার ঈদ কি? ঈদ অইল আপনেগ লেইগ্যা, বড়মিয়া সাব। হ্যা—হ্যা—হ্যা।

মোড়ল ভ্রূকুটি করে। আস্তে আস্তে সে সেক্রেটারীকে বলে—এ হারামজাদাকে এক কণা চিনিও দিতে পারবা না, কইয়া রাখলাম।

গদু প্রধান এতক্ষণে কথা বলে—কি মোল্লার পো, চা অইব নি? তারপর নিজেই হাঁক দেয়—ওরে নসুয়া, চা দিয়া যা দুই কাপ।

রোজ ভোরে খুরশীদ মোল্লার বাড়ীতে তাগাদা দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস তার। ভুলেও তার একদিন বাদ যায় না। রোজার মাসে মুখ বন্ধ ছিল বলে এক মাস খুরশীদ মোল্লা গদু প্রধানের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। মুখ খোলার সাথে সাথেই তার আগমনে খুরশীদ মিয়া বিরক্ত হয়। সে খলিল বকৃশের দিকে চেয়ে বলে—আপনি খাবেন না, কাজীর পো?

—হ, খাইমু। খাইমু না ক্যা? তুমি ত বা'জান চিনির রাজা।

খুরশীদ হাঁক দেয়—তিন কাপ, তিন কাপ ক'রো চা।

খলিল বক্‌শ বলে—আর যা কর, কর। আমার ছয়সের চাই-অই। এইডুক না অইলেই অইব না। তুমি ত জ্ঞাত আছ, এক পাল পৈষ্যের সংসার আমার।

গতু প্রধান বলে—আমার পাঁচ সের আগে রাইক্যা তারপর ভাগ কর। পাঁচ সের না পাইলে ফাডাফাডি আছে তোমার লগে।

—কাকে রেখে কাকে দিই। আচ্ছা, দেখা যাবে। এ পাঁয়তাড়া আর কদ্দিন ভালো লাগে, বলুন। বিনে পয়সার চাক্‌রি। ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিই এই মুহূর্তে।

—না না, ছাড়বা ক্যা? তুমি না অইলে—

—ব্যাপার দেখুন না। এত খাটছি তবু—নাম নাই। সবাই বলে চোর।

—কোন্ শালা কয়? দেইক্যা নেই তার গর্দানে কয়ডা মাথা।

চা আসে। তিনজনে তিনটা বাটি নিয়ে চুমুক দেয়। জমিদারের পাইক এসে এক টুকরো কাগজ সামনে ধরে। খুরশীদ মোল্লা পরে একটু ব্যস্ত হয়ে বলে—ভবানী বাবু বাড়ী এসেছেন নাকি? আর কে কে এসেছেন?

—না, তিনি একলাই আইছেন। দিন চাইরেক থাক্‌ব। চা খাওনের লেইগ্যা তাই—

—আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে বলতে হবে না আর। মাত্র পাঁচ সের ত? তুমি যাও। আমি নিজেই দিয়ে আস্‌বখন। এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আস্‌ছি আমি।

চা শেষ করে খুরশীদ মোল্লা দোয়াত কলম নিয়ে উবু হয়ে বসে। দুই টুক্‌রো কাগজে দুটো পারমিট লিখে খলিল বক্‌শ ও গতু প্রধানের হাতে দিয়ে বলে—চার সের করে লিখে দিলাম আপনাদের। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের দিতে হবে আবার।

বাইরের লোক এতক্ষণে উতলা হয়ে গেছে। কেউ কেউ চলেও গেছে এর মধ্যে।

এবার খুরশীদ মোল্লা উঠে তাদের উদ্দেশ করে বলে—আমি কি করতে পারি বল তোমরা। গভর্ণমেণ্ট মোটে সাপলাই দেয় না তার আর—হ্যা শোন, অল্প কিছু চিনি আছে হাতে। মাথা পিছু এক তোলা করেও পড়বে না। তার চেয়ে বরং এক কাজ করলে হয়, আবার যখন চিনি আস্‌বে তার সাথে মিলিয়ে ভাগ করে দেওয়া যাবে।

একজন আর একজনকে বলে—চল্, যাইগা। এই সব না দেওয়ার ছল-চক্কর। এইখানে হত্ তা ধইর‍্যা থাকলে জামাত্ পাওয়া যাইব না।

সব লোক সরতে আরম্ভ করে। খুরশীদ মোল্লা আবার বলে—কি করবে আর। গুড় কিনে নাও গে।

একজন বলে—গুড়ের সের দেড় ট্যাকা। আমরা কি অত পয়সার গুড় কিন্যা খাইতে পারি, মিয়া সাব? রেশমের চিনি অইলে তয়—

কথা শেষ না হতেই আর একজন বলে—আপনেরাই ঈদ করেন। আপনেগ দিন দিছে খোদায়, ঈদ করতে দিছে।

কথাগুলি কোন রকমে হজম ক'রে খুরশীদ মোল্লা অন্দরে যায়। এক্ষুনি জমিদার বাড়ী যাওয়া তার দরকার।

হাসু এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। সে এবার বাজারের দিকে পথ দেয়।

বাজারের একটা জায়গায় সারি সারি গুড়ের হাঁড়া ও জালা সাজিয়ে দোকানদাররা বসেছে। আজ এদিকে খুব ভিড়। মাছি-মৌমাছিও ভিড় করেছে গুড়ের উপর। কয়েকটা ভিখারী ছেলে গুড় কেনার নামে এ-মাথার থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সমস্ত হাঁড়ার গুড় চেখে বেড়াচ্ছে। এক দোকানীর তাড়া খেয়ে একটি আধপাগল ভিখারী ছেলে বল্‌ছে—অমন কর ক্যা? ঈদের দিন এট্টু মিডা মুখ করি, মিয়া ভাই। হি—হি—হি—।

দোকানীরা খরিদ্দারের সাথে দর কষাকষি করে, গুড় মেপে দেয়। আবার মাঝে মাঝে গামছা নেড়ে মাছি তাড়ায়।

হাসু একটা হাঁড়ির থেকে আঙ্গুল দিয়ে একটু গুড় মুখে দিয়ে বলে—একটু কড়া জ্বালের। ড্যাট্যাকা কইর‍্যা দিবানি? হে অইলে ছ্যাও এক পোয়া।

—উঁহু। এক ট্যাকা বারো আনার এক আধলাও কম না।

পেছন থেকে একজন হাসুকে টান দেয়। সে হাসুদের প্রতিবেশী কেরামত। সে বলে—মিডাই না কিন্যা চিনি লইয়া যা। এই স্থাখ আমিও কিন্‌লাম। দুই ট্যাকা কইর‍্যা চিনি। মিডাইর তন ভাল বরকত্ দিব।

—কোন্ ঠায়?

—লতিফ মোল্লার দোকানে। খুরশীদ মোল্লার ভাই লতিফ মোল্লা। পিছ্-দুয়ার দিয়া যা চুপ্‌চাপ।

হাসু বলে—ও, ফুট কুমুডির চিনির এই দশা! হেই ত আমরা কই, চিনিগুলা কই যায়?

—আর কইস না। ব্যালাক চালাইয়া ব্যাটা ফুইল্যা গেল।

হাসু একটু চিন্তা করে বলে— থাউকগা। মিডাই কিন্যা লইয়া যাই। হাসু বাজার নিয়ে বাড়ী আসে।

খেতে বসে হাসু ও মায়মুন। খাওয়ার সময় সুড়ুত সুড়ুত শব্দ হয় ওদের মুখে।

হাসু বলে—শিন্নি পাইন্‌সা অইয়া গেছে মা, মিডা অয় নাই এক্কেরেই।

জয়গুন বলে— যেমন গুড় তেমন মিডা। তিন পোয়া চাউলে এক পোয়া গুড়। মিডা অইব কেম্‌নে?

— নাইকল দেওনে তবু একটু সোয়াদ অইছে, না মা?

—হ। আলা-চাউল অইলে দেখতি কেমুন মজা অইত। সিদ্ধ-চাউলে আর কি অইব ?

—আরেট্টু দ্যাও, মা।

—উঁহু, অহন আর না। ঈদগার তন আইয়া আবার খাবি।

—ঈদের দিনও এট্টু মন-আচ্ছি মতন খাইমু না ?

—তোগই পেট আছে, অ্যা ? আর কেঅর নাই ? শফীডাকে এট্টু দিয়া আইতে অইব। ওগ ঘরে যে কিচ্ছুই পাক অয় নাই।

হাসু এবার চুপ করে। মায়মুনের পাতেরটা শেষ হয়ে গেছে। সে আঙ্গুল দিয়ে তখনও চাট্‌ছে থালাটা।

জয়গুন বলে—অহন আত ধো। তুই দ্যাখতে আছি বাসনডা ভাইঙ্গা খাইতে চাস্।

মায়মুন লজ্জিত হয়। থালায় পানি ঢেলে সে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে।

জয়গুন হাসুকে বলে—মাচার উপ্‌রের তন কালা কাপড়ের গাট্টি নে। ওডার ভিত্‌রে একটা টুপি আছে। ওডা তুই নে আর নতুনডা কাসুরে দিয়া আয়।

—আমি পারতাম না, মা। হাসু বলে।

—ক্যা ?

ঐ দিনের চরকি দিতে যাওয়ার বিপদের কথা হাসু মা-কে বলে নি। সে বলে—আমি ঈদগায় যাইমু, মা। নমাজের ওক্ত অইয়া গেছে। তুমি আর কেঅইরে দিয়া…

—আর কারে পাডাই ? তুই-ই যাওনের কালে একটু ঘুইর‍্যা ওইখান অইয়া দিয়া আয়।

হাসু আর গোপন রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলে সে-দিনের সব কথা।

জয়গুন অসহায়ের মত তাকায় ছেলের মুখের দিকে। শেষে বলে—

আগে কইস নাই ক্যা? এত পয়সার টুপিডা ফালাইয়া দিমু? তোর মাথায়ও লাগব না।

—কানা-মামানীরে দিয়া পাডাইয়া ছাও।

কথাটা জয়গুনের পছন্দ হয়। শফীর মা বুড়ো মানুষ। সে নিয়ে গেলে করিম বক্শ লজ্জায় কিছু বলবে না। রাখতেও পারে। তা ছাড়া ঈদের দিন। খুশীর দিন সে হয়ত রাগ করবে না।

হাসু গাঁট্‌রি খোলে। বাপের কিস্তী টুপিটা বের করে মাথায় দেয়। টুপিটা অনেক বড় হয়েছে। কান পর্যন্ত ডুবে যায় টুপির মধ্যে।

জয়গুন হাসুর দিকে এক নজর চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে আর তাকাতে পারে না।

হাসু গামছাটা কাঁধে ফেলে কোষায় চড়ে। শফীর মা এবং শফীও আসে কোষায়। হাসুকে ঈদগাহ্ যাওয়ার রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে শফীর মা শফীকে নিয়ে করিমবক্শের বাড়ী যাবে। এখন যাওয়াই ভালো। করিমবক্শ এখন বাড়ীতে নেই। নামাজ পড়তে গেছে নিশ্চয়।

শফীর মা টুপিটা দিয়ে নিরাপদেই ফিরে আসে।

জয়গুন খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করে কাসুর কথা।

—টুপিডা ঠিক অইলনি মাথায়?

—হ, টুপিডা মাথায় দেওনে এমন সোন্দর দেখাইল কাসুরে, কি কইমু তোমারে—যেন্ একটা পরীর বাচ্চা!

শফীর মা আবার বলে—সময় বুইঝ্যা গেছিলাম গো। করিমবক্শ বাড়ীতে আছিল না। নমাজ পড়তে গেছিল্। ওর বউরে তালিম দিয়া অইছি। টুপি যে তুমি দিছ তা সে কইব না। সে কইব, সে-ই কিন্যা দিছে।

জয়গুন নিশ্চিন্ত হয়। তার ভয় ছিল করিমবক্শ হয়ত ছেলেটাকেই বতে শুরু করবে।

শকীর মা বলে—করিমবকৃশের বউ মানুষ ভালা। খুব হাসি-খুশী। আমারে পিঁড়ি দিল বস্‌বার। নিজেই এই এত বড় একটা আস্ত ধল-ডোগ পান ছেইচ্যা দিল।

জয়গুন বলে—কাসু কিছু কইল?

—উঁহু। ও আমার মোখের দিক চাইয়া আছিল। এক্কেরে এতীমের মত—যেন্ বাপ-মা নাই।

—তুমি কোলে নিলা না?

—নিলাম ত। আমার কোলের তন আর কি নামতে চায়! এক্কেরে বুকের লগে মিশ্যা আছিল। তারপর কত কোস্তাকুস্তি কইর‍্যা কান্দাইয়া নামাইয়া থুইয়া আইলাম। কি জানি, করিমবক্‌শ আইলে আবার কি কাণ্ড কইর‍্যা ফালায়।

জয়গুন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করার চেষ্টা করে।

নয়

জয়গুন ও হাসু আজ সকাল সকালই বেরিয়ে গেছে।

মায়মুন হাঁস দুটো খাঁচার থেকে বের করে পানিতে ছেড়ে আসে। এবার সে হাঁসের বাচ্চা দুটো বের ক'রে ঘরের মেঝের ওপর ছেড়ে দেয়। নিজেও হাতদুটো মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে চেয়ে থাকে। হলুদ রঙের বাচ্চা দুটো কেমন সুন্দর হাঁটে আর চিপ্ চিপ্ করে। মায়মুনের আনন্দ হয়।

কাল মায়মুন বাচ্চা দুটো নিয়ে এসেছে। যোনা চাচী বলে দিয়েছে—আমারে কিন্তু আণ্ডা খাওয়াবি দুইজোড়া; আমার মুরগীর উমে ফোট্‌ছে। আমারে না খাওয়াইলে পাতি-শিয়ালে ধইর‍্যা লইয়া যাইব, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন স্বীকার ক'রে এসেছে, সোনা চাচীকে প্রথম ছুইদিনের ডিম সে দেবে। তাকে আগে না খাইয়ে নিজেরা ছোঁবেও না ডিম।

কাল বাচ্চা ছুটো নিয়ে আসার পর থেকে মায়মুন ওগুলোকে নিয়েই কাটিয়ে দেয়। কখনো মাটির ওপর ছেড়ে দেয়, আবার কখনো বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। রাত্রে শুতে যাওয়ার সময়ও সে বাচ্চা ছুটো কাছ ছাড়া করতে চায় না।

জয়গুন ধমক দিয়ে বলে—সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়। খাঁচার নীচে রাইক্যা আয় জল্‌দি। না'লে চুল ছিড়্যা ফালাইমু টাইন্যা।

মায়ের ধমকের কাছে মায়মুন এতটুকু হয়ে যায়।

বাচ্চা দুটো খাঁচার নীচে রেখেই সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত সজাগ থেকে সে শুনতে পায় বাচ্চা ছুটোর ডাক, মাঝে মাঝে চিপ চিপ করে ওঠে ওগুলো। শিশুর কান্নায় অসহায় মায়ের মত অবস্থা হয় মায়মুনের।

মা চলে যাওয়ার পর মায়মুনের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবার তাকে বলবার কেউ নেই। বাচ্চা ছুটোকে খাঁচার নীচে রেখে সে উঠানের দক্ষিণ পাশে লাউ-মাচার নীচে একটা জায়গা বেছে নেয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চৌকা একটা গর্ত করে। পানি ঢেলে ঢেলে সেটাকে ভরে। তার পর বাচ্চা ছুটোকে ছেড়ে দেয় তার মধ্যে।

হাঁসের বাচ্চা ছুটোর নতুন অভিজ্ঞতা। জন্মাবার পর এই প্রথম তারা পানির পরশ পায়। সেজন্যে পানিতে ছেড়ে দিতেই ভয় পেয়ে উপরে উঠে আসে। মায়মুন ভাবে—ছ'দিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। বড় হাঁসের মতই সাঁতরাবে তখন।

মায়মুন গর্তটার চারদিকে কতগুলো লম্বা পাটখড়ি পুঁতে দেয়। এমনিভাবে লাউ-মাচার সমান উঁচু করে সে একটা বেড়া বানিয়ে ফেলে। চিল বা বাঁজ ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে না পারে, সেইজন্যে এ-সতর্কতা।

মায়মুন বাড়ীর চারপাশ ঘুরে ছোট বড় নানারকমের শামুক কুড়িয়ে আনে। দা দিয়ে সেগুলোর খোসা ছাড়ায়। তারপর কুচিকুচি করে কাটতে কাটতে গান গায়—

শামুক খাজারে, আমার বাড়ী আয়,
কুচি কুচি শামুক দিমু, হলদি দিমু গায়,
ওরে শামুক খাজারে,
তোর বাড়ী অনেক দূরে, সাত পাক ঘুইরে ঘুইরে
আমার বাড়ী আয়।

শফী এসে পাশে দাঁড়ালে মায়মুনের গান বন্ধ হয়ে যায়।

শফী বলে—এইগুলা দিয়া কি করবি?

মায়মুন কিছু না বলে হাঁসের বাচ্চা দুটো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

—দে আমি কাইট্যা দেই।

—উঁহু, আমিই পারি কত কাট্‌তে।

মায়মুন একটা পাতায় করে কুচিকুচি করে কাটা শামুক নিয়ে বাচ্চা দুটোর সামনে ধরে। বাচ্চা দুটো কয়েক বার ঠোঁট দিয়ে নেড়ে খেতে শুরু করে।

শফী বলে—বাহ্, খাইতে শিখ্‌ছে রে। কেমুন ক্যাৎ ক্যাৎ কইর‍্যা খায়। দ্যাখ্ চাইয়া।

—দেখছি।

মায়মুন বসে বসে দেখে।

শফী বলে—আমারে একটা বাচ্চা দিবি?

—ইস্।

—পয়সা দিমু আষ্ট খান্।

—উঁহু, একটাকা দিলেও না।

—ফুলকুরি দিমু। আর চুলের কিলিপ।

মায়মুন বলে—উঁহু, সাত রাজার ধন মাণিক্য দিলেও না।

—না দিলে চুরি কইর‍্যা লইয়া যাইমু তোর আঁস, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন এবার চেঁচিয়ে ওঠে—মামানি, ও-মামানি, দ্যাখ, তোমার পোলা কেমন লাগাইছে। তারপর হাঁসের বাচ্চা রাখবার গর্ত থেকে পানি ছিটিয়ে দেয় শফীর চোখে-মুখে।

শফীর মাও শফীকে ডাক দেয়—অ্যারে শফী, কি শুরু করলি? আমি আইলে ঠ্যাঙ ভাঙমু কিন্তু।

—না মা, ফাঁকিজুঁকি দিলাম আমি।

কলাগাছের ভেলায় চড়ে শফী ও মায়মুন মোড়লদের ছাড়া ভিটেয় যায় লাকড়ি কুড়াতে। শফী জঙ্গলের ভেতর দিকে নিয়ে যায় মায়মুনকে। শফী গাছে উঠে শুকনো ডাল ভেঙ্গে নীচে ফেলে। মায়মুন কুড়িয়ে জড়ো করে একখানে।

শফী গাছে চড়তে বেশ ওস্তাদ। এক গাছের ডাল বেয়ে সে আর এক গাছে চলে যায়। মায়মুন বলে—আর উই-মুখী যাইওনা শফী ভাই, ওই গাবগাছে—

—কি ঐ গাবগাছে?

—আলেক মোড়লের বউ গলায় দড়ি দিছিল্ ঐ গাবগাছে, তুমি বুঝিন্ জান না?

—হেতে কি অইছে?

—উঁহু, আমার ডর করে। তুমি নাইম্যা আহ হবিরে।

শফী গাছ থেকে নেমে বলে—মায়মুন, চাইয়্যা দ্যাখ দেহি ঐ দিগ, ঐ গাবগাছে কালা একটা কি দ্যাহা যায়।

মায়মুন ঐ দিকে না চেয়েই 'ওগো মাগো' বলে শফীকে জড়িয়ে ধরে। শফী জোরে হেসে ওঠে। বলে— আরে কিচ্ছু না, ফাঁটকি, একদম

ফাঁট্‌কি। দিনে-দুপরে কিয়ের ডর? চাইয়্যা ছাখ্‌। ছাখ্‌ না ছেঁড়ি। কিচ্ছুই না, চউখ মেল্‌ এইবার।

মায়মুন তবু চোখ খোলে না।

শফী ওকে কোলে তুলে ভেলার কাছে নামিয়ে দেয়। মায়মুন এতক্ষণে চোখ মেলে। সে বলে—তুমি কি ফাজিল। খামাখা ডর দেহাইলা।

শফী হাসে হি-হি ক'রে।

মায়মুন বলে—তুমি গিয়া লাকড়ি লইয়া আহ। আমি আর যাইতে পারতাম না।

শফী বাগানে যায়। শুক্‌নো ডালগুলো একটা লতা দিয়ে বেঁধে মাথায় করে নিয়ে আসে। তারপর বাড়ী এসে দুটো ভাগ করে। নিজের ভাগের থেকে কয়েকটা ডাল মায়মুনকে দিয়ে বলে - তোরা মানুষ বেশী। এই ক'টা বেশী নে তোরা।

বিকেল বেলা মায়মুন তেঁতুল-তলায় বড়শী নিয়ে বসে। তার কোলের কাছে হাঁসের বাচ্চা দুটো। আবার শফী এসে জোটে সেখানে। একটা ঢিল ওর বড়শীর কাছে ছুঁড়ে শফী তেঁতুল গাছের আবডালে পালায়।

মায়মুন কিছু দেখতে না পেয়ে দাঁড়াতেই শফী হেসে ওঠে—হি-হি-হি!

মায়মুন বলে—তুমি বড় শয়তান। চাইঙ্গা মারলা ক্যান্‌?

—কই চাইঙ্গা! মাছে ডাফ দিল ছেঁড়ি। জবর মাছ অইব রে! বোয়াল মাছ।

মায়মুন মাথা নেড়ে বলে—হুঁ, বোয়াল মাছ।

—হ-রে হ। কি মাছ পাইছস্‌?

—কিচ্ছুই না। একটা তিঁত্‌ পুঁডিও না।

—কিচ্ছুইনা?

—ও-হোঁ।

শফী আশ্চর্য হয়। তার পর গম্ভীর ভাবে বলে—তোর বড়শীতে ক্যার জানি মোখ লাগছে রে। কেও নষ্ট না করলে এমুন অয় ? আমার মনে অয় কেও ডিঙ্গাইয়া গেছে তোর ছিপ। হেই-এর লেইগ্যা মাছ ওঠ্‌তে আছে না।

মায়মুন শফীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

শফী বলে—পোড়াইয়া নে আগুনে। ঠিক অইয়া যাইব।

শফী ও মায়মুন মাটির হাতায় আগুন নিয়ে বড়শীটা পোড়া দেয়। তারপর একসঙ্গে সুর ক'রে বলে—

বড়শী পুড়ি, বড়শী পুড়ি
ট্যারা পড়শীর মোখ পুড়ি,
মাছ ধরমু দুই কুড়ি॥
লোয়ার বড়শী সূতার ডোর
পুঁডি-পাবদা, শিঙ-মাগুর॥
বড়শী আমার প্যাদা
ধইর‍্যা আনব ভ্যাদা—
ভ্যাদা-মাছে 'ক্যাদা' খায়
পুঁডি-মাছে পান চাবায়॥
অ—হো—হো—হো—হি—হি—হি!

শফী ও মায়মুন দু'জনে হেসে লুটোপুটি। শফী মাটি খুঁড়ে কেঁচো তুলে দেয়। মাছ কেঁচোর টোপ খায় ভাল।

মায়মূন আবার বড়শী নিয়ে বসে।

সন্ধ্যার পর মায়মুন শফীর মা-র ঘরে যায়।

শফীর মা বলে—আমার পানডা ছেঁইচ্যা দে ত, ময়মন। তুই ভাল

ছেঁচতে পারস। শফী পারে না। ও দিলে কোনদিন খ'র বেশী অয়, আবার কোনদিন চুন বেশী পড়ে।

প্রশংসায় মায়মুন খুশী হয়। কলাপাতায় জড়ানো পান খুল্‌তে খুল্‌তে মায়মুন বলে—কতডুক্‌ নিমুগো, মামানি ?

— আধ খান নে। তয় অডুকে গাল ভরে না। গাল না ভরলে, কি পান খাইয়া সুখ আছে। কিন্তু কি করমূ আর। গাছের পাতা হেই-এর যে দাম। হোন্‌লে মাথা ঘোরে। দুইটা পান একটা পয়সা। আগে এক পয়সায় একবিড়া পাওয়া যাইত।

মায়মুন ঠনর ঠনর করে পান ছেঁচতে আরম্ভ করে।

শফীর মা আবার বলে—আইজ কাইল বেবাক জিনিসই আক্রা। আগে এক টাকায় আধমন চাউল মিল্‌ত। আমার বয়সেই দেখছি। আর অহন বেবাক জিনিসের উপর তন খোদার রহমত উইট্যা গেছে। আগে একটাকার বাজার কিন্‌লে এক মরদের এক বোঝা অইত। আর অখন একটাকার বাজার আতের তালুতে লইয়া বোম্বাই শহরে যাওন যায়।

শফীর মা বলেই চলে—তোর মামু একটা ইলসা মাছ আন্‌ছিল দুই পয়সা দিয়া কিন্যা। তখন শফী অয় নাই। মফি আমার পেডে। এই এত বড় মাছটা। হেইডার এক জোড়া আণ্ডা যা অইছিল— এই এক বিঘৎ লম্বা। তখন আমার বুক জুইড়্যা ওরা ভাই বইনে চাইর জন। কত খুশী অইছিল হেইঁ আণ্ডা দেইখ্যা।

শফীর মা আর পুরাতন স্মৃতি ঘাট্‌তে সাহস পায় না। সে সব সময়ে ভূলে থাকতেই চেষ্টা করে। কিন্তু কথায় কথায় বা একা বসে থাকলে যখন সে স্মৃতি এসেই পড়ে, তখন সে আর তা সহ্য করতে পারে না। বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে শুরু করে। তার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে সে নয় সন্তানের জননী। কিন্তু একমাত্র শফী-ই বেঁচে আছে। বাকী

আটটির চারটি আঁতুড়েই শেষ হয়। দুইটি কলেরায় আর একটি পরে মারা যায়। আর একটি—তার নাম মফি, শফীর দুই বছরের বড় ছিল—দুর্ভিক্ষের বছর সে কোথায় হারিয়ে যায়। শফীর মা আজও এ ছেলেটির আশা ছাড়েনি। তার ধারণা মফি এখনও বেঁচে আছে।

মাঝে মাঝে শফীর মা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বলে—আমার ও-রা বাইচ্যা থাকলে এই দশা আমার? আইজ আমি খ'রাত কইর‍্যা খাই। ওরা বাইচ্যা থাকলে আমার বাদশাই কপাল আছিল। ওরা কামাই করত। ও-গ বউ আইত ঘরে। বউরা রাইন্দা-বাইন্দ্যা সামনে ধরত। সোনার খাটে বইস্যা রূপার খাটে পাও রাইখ্যা আমি সব দ্যাখতাম আর হুকুম করতাম। নাতি-নাতকুড় ঘির‍্যা বইত চাইর পাশে। ক্যাচ-ম্যাচ করত কিচ্ছা হোননের লেইগ্যা।

শফীর মার চোখ দিয়ে দর দর করে পানি গড়িয়ে পড়ে। মায়মুন দেখে আশ্চর্য হয় না। কারণ এ আজ নতুন নয়। কখন সে কাঁদবে আর কখন কাঁদবে না কেউ বল্‌তে পারে না। মায়মুন ছেঁচনীর থেকে ছেঁচা পান তুলে ধরে। শফীর মা মুখে দেয়।

মায়মুন এবার বলে —একখান কিচ্ছা কওনা, মামানি?

—নালো। আইজ আর পরাণডা ভাল্ ঠেকে না।

মায়মুন আর অনুরোধ করে না। শফীর মা বলে—তুই একটু দেইখ্যা আয় ত শফী কি দিয়া কি রান্‌দে। কয়ডা কলমীর শাক রানব আর ভাত। কাইল ভাত ফুটছিল কম। চাউল চাউল ভাত গিল্যা গিল্যা খাইছি। দাঁত-দন্ত না থাকা আর এক জ্বালা।

মায়মুন রান্নাঘরে যায়। চুলোর ওপর বসানো ভাতের হাঁড়ির থেকে কয়েকটা ভাত তুল্‌তে তুল্‌তে শফীকে বলে—একটা শোলক্ ভাঙ্গাও দেহি শফী ভাই—

একটু খানি পুকুরে মাছ ঝক্ ঝক্ করে,
একটা মাছে টিপ দিলে
বেবাকগুলা মিলে ॥

—ইস জবর শোলক ত। এইডা শিক্‌খা রাখছি কুট্টি কালে—পুকুর অইল আঁড়ি আর মাছ অইল ভাত। কেমুন? অইছে? এইবার একটা মাছে টিপ্ দিয়া ছাখ দেহি ফোট্‌ল নি।

মায়মুন একটা ভাতে টিপ দিয়ে বলে—অইয়্যা গেছে। ছাখ ত কেমুন মজা। একটা ভাতে টিপ দিলে বুঝা যায় ফোট্‌ল নি, না ফোটল না।

—আর একটু ফোটতে দে। মা আবার শক্ত ভাত খাইতে পারে না?

—কাইল তুমি শক্ত শক্ত চাউল চাউল ভাত রানছিলা, মামানি কইছে। তুমি কি! ভাত রানতে জান না?

—আমি জানি না, কে জানে রে? টিক্কাদার সা'বের বাসায় এত-কাল পাক কর্‌লাম আমি। আইজ তুই আমারে শিখাইতে আইছস?

রান্না সেরে শফী ও মায়মুন ঘরে আস্‌তে শফীর মা বলে—তোর মা অহনো আইল না, মায়মুন? রাইত যে অনেক অইল।

বাইরে চ্যাবড় চ্যাবড় পায়ের শব্দ শোনা যায়। উঠানের কাদার মধ্য দিয়ে কে যেন আসছে।

শফীর মা ডাকে – হাসুর মা?

—হ ভাজ, আমি অই।

—আহো আমার ঘরে।

জয়গুন এসে দরজায় দাঁড়ায়। শফীর মা বলে—তোর হায়াত আছে। অনেকদিন বাঁচবি তুই। এই একটু আগেও তোর নাম নিছিলাম।

—অহন যাই বইন। আখা ধরাইতে অইব আবার।

—আইচ্ছা যাও। আখা ধরাইয়া এট্টু এদিগে আইস, তোমার লগে কথা আছে।

—কি কথা ?

—পরে কইমু। অহন যাও। চাউল কি দর আনলাগো ?

—দুইসের, বইন। দর চইড়্যা গেছে। আর যা মছিবত আইজ কাইল। ট্যারেনে যা মানুষের ভীড়। জেরের এই দুই কিস্তি ধইর‍্যাই এই রহম। আগে এমন ভীড় আছিল্ না।

জয়গুন পাক চড়িয়ে শফীর মার ঘরে আসে। শফীর মা বলে—কদিন ধইর‍্যা একটা কথা কইমু কইমু করতে আছি। কিন্তু সময় মত একটু একখানে বইতে পারি না। তুমি থাকলে আমি থাকি না, আমি থাক্‌লে আবার তোমার দ্যাহাই মিলে না।

—কি কথা ?

—কই, সবুর কর্। পান খাইলে একটু খা, ঐ দ্যাখ্ তোর পিছে পাতার মধ্যে।

জয়গুন পান খেতে খেতে বলে—কি কথা এইবার কও দেহি ভাজ।

—রাখ্ না, কই। আমার এই কাপড়ডা একটু তালি দিয়া দিবি ? আমি আবার সুঁইয়ে সূতা গাঁথতে পারি না ছাই, চউখ টা এক্কেরেই গেছে।

—আইচ্ছা।

—ছিড়া কাপড় পিন্দা বাইরে যাইতে লজ্জা করে। তুই একটু সিলাইয়া দিলে তবু বেড় দিয়া পিন্‌তে পারমু। তোর আতে সিলাইডা অয় ভালা।

শফীরে দিয়া পাঠাইয়া দিও। এই এর লেইগ্যাই বোলাইছিলা ? জয়গুন উঠতে উদ্যত হয়।

—না, আরো কথা আছে, ব'।

—কও কি কথা।

—ফকিরের লগে তোর দেহা অয় না, অ্যা? তোরা ত কত দূরে দূরে যাস্। একদিনও চউখে পড়ে না?

—উহুঁ।

—ছ্যাখ দেহি কেমুন বে-য়াক্কেইল্যা। কতদিন গুজারিয়া গেল, বাড়ীর পাহাড়া আর বদলাইয়া দিয়া গেল না। আমার ত রাইতে ঘুমই আহেনা ডরে। তুইও আমল দিবি না।

—উহুঁ, পাহাড়া বদলাইতে অইব না আর। পাহাড়া না ছাই। ফুক্কা দিয়া টাকা নেওনের ছল-চক্কর।

—ছল-চক্কর? তুই যে কী কস্! আইচ্ছা, সূর্য-দীগল বাড়ীতে থাকৃতে তোর কি পরাণে ডর-ভয় লাগে না?

জয়গুন উঠতে উদ্যত হয়।

শফীর মা বাধা দেয়—ব'। আদত কথা ত অহনো কই নাই।

—কি আদত কথা, কও।

—তোরে আগেও কয়বার আমি কইছিলাম। তুই আমার কথা ঠেইল্যা দিলি।

—ঠেলমু না কি করমু?

—এইডা কি ঠেলনের মত কথা?

—তয় কি?

—তোর ভাই বাইচ্চা থাকলে কি তার কথা ঠেল্‌তে পারতি'? ধইর‍্যা বাইন্দা কবে আবার তোর নিকা দিয়া দিত।

—তুমি মোখ বোজ দেহি। তোমার ঐ এক বুলি আমার আর কানে সয়না।

—হেইয়া সইব ক্যা? আমি তোর ভালার লেইগ্যা কই কি না।

বয়স ত অহানো তিরিশ অয় নাই। অহানো গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা-কাচ্চা পেড়ে ধরণের বয়স আছে।

জয়গুন শ্রান্ত। সে মুখ নিচু করে বসে থাকে।

শফীর মা বলে—গতু পরধান মানুষ ভালা। তার পাঁচটা বলদ, তিনডা গাই। দশ মরাই ধান পায় বচ্ছর। জাগা জমিনের ইসাব-কিতাব নাই। কাম আছে মানি। তয় আমি কই, যেখানে কাম আছে হেই-খানে ভাতও আছে। আর তোর ত একলা কাম করতে অইব না। আগের তিনডা জনানা আছে পরধানের। চাইড্যা পোলার বৌ আছে। এক্কেরে সোনার বাগিচা সাজাইয়া রাখছে। উরাই বেবাক কাম করব। তুই হুকুম দিয়া খাডাবি।

জয়গুনের মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে কিছু বল্‌তে পারে না।

শফীর মা আবার বলে— পরধান কাইলও আমারে ধরছিল। আমি কইলাম, 'পোলা আর মাইয়াডার লেইগ্যাই যত মস্কিল'। হে কইল, 'তা পোলা আর মাইয়াডারে আমার বাড়ীত্ লইয়া আইলেই ত অয়। কত মানুষ খাইয়া বাঁচে আমারডা। দুইডায় আর কি অইব।' এই-বার বিবচনা কইর‍্যা তুই মোখ ফুইট্যা একটু হুঁ করলেই অইয়া যায়। সুখে থাক্‌বি কইয়া দিলাম।

খড়ের আগুনের মত দপ করে জলে ওঠে জয়গুন—হুঁহ্, আমারে তাড়াইতে পারলে লুটিয়া-লাপটিয়া ফলাও কইর‍্যা খাইতে পারবা। তা মনেও জাগা দিওনা, কইয়া দিলাম।

—তো'বা! তো'বা! তোর চীজ ছুইলে যেন্ আত্ খইস্যা পড়ে। তোগ গাছের একটা পাতা ছিঁড়লে যেন্ রাইত না পোয়ায় আমাগ।

জয়গুন যেমন জ্বলে উঠেছিল, শফীর মার কথায় আবার নিবে যায়। সে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে এবার বলে—না বইন, বিয়া ত দুই খানেই

অইল। অনেক গ্যাখলাম, অনেক শিখলাম, আর না। পোলা মাইয়ার মোখ চাইয়া আর পারমু না। মাপ করো। পোলা আর মাইয়াডার বিয়া দেইখ্যা যেন্ চউখ বুজতে পারি। দোয়া কইর্য্য।

শফীর মা নিরাশ হয়ে বলে—তোর মায়মুনের বিয়া দে এইবার। একটা সম্বন্ধ আছে আতে।

—না, এত শীগ্গীর কি অইল? যাউক আর দুই বচ্ছর।

—না, না। মাইয়া তোর বিয়ার লায়েক অইছে। আর ঘরে রাখা ঠিক না।

জয়গুন একটু চিন্তা করে বলে—কোথায় সম্বন্ধ আছে?

—সদাগর খা'রে তুমি ত চিনই। তার নাতি—সোলেমানের ব্যাটা। নামটা যেন্ কি? ভুইল্যাই গেলাম বুঝিন্। অ-হো মনে পড়ছে, ওস্‌মান, ওস্‌মান।

—ওঃ, ওস্‌মান? ওস্‌মান ত বিয়া করছে।

—করছিল। বউ মইর‍্যা গেছে চৈত্ মাসে ভেদের ব্যারামে।

—কিন্তু পোলার বয়স যে অনেকখানি।

—তোমার মাইয়াডার বয়সই কম কি?

—কম না? আমার মাইয়ার বয়স যে মোডে দশ, ধরতে গেলে দুধের মাইয়া আমার।

—দুধের মাইয়া! কি যে কস্ তোরা ছাই-মুণ্ডু। মাইয়ারা এই বয়সে বাচ্চা বিয়ায়। আমার মা-র এগার বচ্ছরের কালে আমার জন্ম অয়।

শফীর মার সাথে কথায় পেরে ওঠে না জয়গুন। সে বলে—আইচ্ছা, ভাইব্যা চিন্তা দেহি। পরে কইমু। নছিবে যদি ঐ খানের ভাত লেইখ্যা থাকে তয় অইব। কার কোন্ খানে দানা-পানি লেখা আছে, খোদা জানে। অহন যাই। ওদিগে আবার ভাতের আঁড়ি না ভাইঙ্গা ফালায়।

জয়গুন বাইরে নাম্‌তেই চোখে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সে চার-দিকে চেয়ে বলে—উত্তরে আর পূবে যে মেঘ করছে, ভাজ! আইজ বুঝিন্ আসমানশুদ্ধ ভাইঙ্গা পরব। আইজ আর উপায় নাই। এই ব্‌ষ্যাকালডা ভিজ্‌তে ভিজ্‌তেই গেল। তোমার ঘরের চাল ত ভাল আছে। আমার চালে ছন্‌ই নাই।

—আমার চালে আর কই আছে? হেই কবে গেল বচ্ছরের আগে ঠিক করছিলাম। তবু বিষ্টি পড়ে ছয় সাত জা'গায়।

—কি করমু আর! কপালে আছে ভিজতে অইব, ভিজ্‌মুই। পাঁচটা টাকাও একখানে করতে পারলাম না। ঘরের চাল ছাওয়াই কি দিয়া? উদর লইয়া আর পারলাম না। উদরে যায় বেবাক ট্যাকা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। জয়গুন ঘরে যায়। মায়মুন রান্না শেষ করেছে।

—চালাক কইর‍্যা ভাত খা তোরা। আস্‌মানের দিগে চাইছিলি? কাউয়ার আণ্ডার মত কালা অইছে আস্‌মান। আইজ আবার ঘরের মধ্যে সোত ছুটব। তোরা খাইয়া-লইয়া উত্তরমুখী বিছনা সরা।

অসংখ্য ছিদ্র পথে বৃষ্টির পানি ঝরতে থাকে ঘরের ভেতর। তা ছাড়া দক্ষিণ বাতাসের জন্য বৃষ্টির ঝাপ্‌টা দক্ষিণ দিকটায় লাগে বেশী। এজন্য উত্তর দিকটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, হাসু ও মায়মুন জানে। তাড়াতাড়ি খেয়ে তারা বিছনা সরায় ঐ দিকে।

জয়গুন বলে—একটা ক্যাঁথাও পাইড়া নেইগ্যা। তার পর কুকৃড়ি-মুকৃড়ি অইয়া শুইয়া থাক ভাই-বইনে।

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে জোরে। সত্যি সত্যি আকাশটাই ভেঙ্গে পড়্‌ছে যেন। এশার নামাজ প'ড়ে ছেলে-মেয়ের শিয়রের কাছে তস্‌বীহ হাতে বসে জয়গুন। সে তস্‌বীহ্‌র দানা গুণ্‌ছে কি সময় গুণ্‌ছে বোঝা যায় না। এক ঘণ্টা পরে বৃষ্টির বেগ কমে। কিন্তু বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়

না একেবারে। এখন যে রকম অলস-বর্ষণ শুরু হয়েছে, তাতে সারা রাতেও বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। জয়গুন কাঁথার উপর হাত দিয়ে দেখে কাঁথাটা ভিজে গেছে। সে এক পাশে শুয়ে পড়ে।

হাসু হঠাৎ জেগে উঠে বলে—পায়ের কাছটা একদম ভিজ্যা গেছে, মা।

—তুই অহনো ঘুমাস নাই?

—উহুঁ।

—আত পা কাঁকড়ার মত কুক্‌ড়ি-মুক্‌ড়ি কইর‍্যা পইড়্যা থাক।

দশ

এমন দিন পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যও সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সারাদিন টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে। হাসু ঘরের বার হয় না। শরীরটাও ভালো নেই। শরীরের সমস্ত গিঁঠে গিঁঠে, বিশেষ করে ঘাড়ে টন্‌টনে ব্যথা হয়েছে।

হাসু মা-কে বলে—গর্দানডায় বেদ্‌না করেগো, মা। কেমুন শীত শীত লাগে।

হাসুর গায়ে হাত দিয়ে জয়গুন শঙ্কিত হয়। ছেলেটা জ্বরে পড়লে উপায় নেই আর। বৃষ্টি বাদলের মধ্যে ছেলেটাকে যে ভাবে সে কাজে পাঠায় তাতে এই ছোট শরীরটার ওপর জুলুমই করা হয়। কচি ঘাড়-টার ওপরেই জুলুমটা হয় বেশী। অথচ এই ঘাড়টা তাদের

জীবন-মরণের কল-কাঠি। তিনটি প্রাণীর জীবনের বোঝা মাথায় নিয়ে হাসুর এই কাঁচা ঘাড়টা মাঝে মাঝে ব্যথাকাতর হয়ে পড়ে।

জয়গুন নিষেধ করে—যাউক, আইজ আর কামে যাওন লাগত না। ক্যাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া থাক। তোরে পঁই পঁই কইর‍্যা নিষুধ করি, ভারী পোঝা মাথায় নিস্ না। তা শুনবি না।

বেশী লোভ করার জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয় জয়গুন। তেরো বছরের এতটুকু ছেলে কামাই করে খাওয়ায়, এই ত বেশী। রোজগার ক'রে সব পয়সা তার হাতে এনে দেয়। একটা পয়সাও এদিক ওদিক করে না। এমন কি এক পয়সার চিনে-বাদাম খেলেও তার হিসেব দেয় তার কাছে।

জয়গুন সর্ষের তেলের শিশি থেকে একটু তেল নিয়ে হাসুর ঘাড়ে মালিশ করতে করতে বলে—পায়ে তুঁইতার পানি দিছিলি কাইল?

—উহুঁ।

—হেইয়া দিবি ক্যান্! দেহি কেমুন অইছে।

জয়গুন পায়ের উপর থেকে ক্যাঁথা সরিয়ে বলে—ছ্যাখ ক্যাদায় চামড়া খাইয়া কেমুন ঝাঁজরা কইর‍্যা দি'ছে।

একটা নারকেলের মালায় তুঁতে-গোলা নিয়ে আসে জয়গুন। হাঁসের পালক ভিজিয়ে হাসুর পায়ের তলায়, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে তুঁতের পানির পোচ দেয়।

হাসু 'উ-হু-হু-হু' করে ওঠে। বলে—আর দিও না, মা। বড় পোড়ায়।

—না দিলে চামড়া পইচ্যা যাইব একেরে। আটতে পারবি না। রাস্তা-ঘাটে যেই ক্যাদা।

জয়গুন নিজের পায়েও তুঁতে-গোলা দিয়ে প্রলেপ লাগায়। মায়মুনের পায়েও লাগিয়ে দেয়। বাড়ীর উঠানে পর্যন্ত কাদা হয়েছে। পায়ের

পাতা অবধি ডুবে যায় কাদায়। তুঁতের প্রলেপ দিলে পায়ের তলা অত হেজে যেতে পারে না।

পরের দিন চমৎকার রোদ ওঠে। জয়গুন হাসুর কপালে ও বুকে হাত দিয়ে দেখে। তার মুখের ওপর থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। প্রভাতী রোদের মত তার মুখ আনন্দে চিকচিক করে। হাসুকে ডেকে সে বলে—ওঠ, ছাখ আইজ কেমুন রউদ ওঠছে।

হাসু উঠে বসে।

জয়গুন বলে – আমার ত ডরেই ধরছিল। কাইল যেই রকম গরম আছিল্ শরীর। জ্বর ওডে নাই কপালের ভাগ্য। কেমন লাগছে শরীর?

—ভালা। আইজ কামে যাইমু, মা।

—আত-মুখ ধুইয়া আয়। খাইয়া তারপর চল্ যাই। আমিও যাইমু। চাউল ফুরাইছে আইজ। চাউল না আনলে ওই বেলা চুলা জ্বলব না।

হাসু ও হাসুর মা কাজে বের হয়। হাসুর মা বার বার হাসুকে নিষেধ করে দেয় – খবরদার, ভারী পোঝা মাথায় নিবি না কিন্তুক। গর্দান ভাইঙ্গা যাইব।

কিন্তু হাসু দুদিনের কাজ একদিনে করার সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। কাল কাজ হয়নি। আজ বেশী কাজ করে অন্ততঃ কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া তার চাই-ই।

হাসু নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে আসে।

আজকাল যাত্রীর সংখ্যা খুবই বেড়েছে। বাইরের থেকে যেমন বহুলোক আসছে, আবার বাইরেও যাচ্ছে তেমনি। বিশ্রাম-ঘরে গাজা-গাজি হয়ে আছে লোক। জাহাজে, গাড়ীতে জায়গা হয় না। অনেক যাত্রীকেই দু'তিন দিন ষ্টশনে পড়ে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়ে

মা-বউ নিয়ে আবার অনেক বিদেশী আশ্রয় নিয়েছে ষ্টেশনের চালা ঘরে।

হাসু মোটের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরে আর এদের দিকে চায়। তার অদ্ভুত লাগে এদের পোশাক। এদের কথাও বোঝা যায় না—হাসু কাছে দাঁড়িয়ে শুনেছে। এক জায়গায় একটি স্ত্রীলোক রুটি সেঁকতে শুরু করেছে। দুটি ছেলে মেয়ের লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর। রেল লাইনের পাশেও এক জায়গায় সে এ রকম আরো অনেক লোক দেখেছে আজ। হাসুর মনে পড়ে দুর্ভিক্ষের বছরের কথা। এ-রকম ভাবে মায়ের সাথে সাথে গাছ তলায় কত রাত কেটেছে। বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নিতে গিয়ে কত লোকের তাড়া খেয়েছে। হাসু অনুমান করে, নিশ্চয় ওদের দেশে আকাল এসেছে।

যাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও হাসু সুবিধা করতে পারে না। নম্বরী কুলি-দের জন্যে মোট ধরবার যো নেই। যাত্রী বেড়ে যাওয়ায় বরং অসুবিধা হয়েছে। ভিড়ের জন্য ঘাটে জাহাজ ধরবার আগেই জেটির গেট বন্ধ হয়ে যায়। নম্বরী কুলি ছাড়া অন্য কুলিরা ঢুকতে পারে না। কেউ জল সাঁতরে ষ্টীমারে ওঠে। কিন্তু নম্বরী কুলিরা দেখতে পেলে মাথার ওপর গাট্টা মারে। হাসু এই কুলিদের খুবই ভয় করে।

ট্রেন ও ষ্টীমারের সময় হাসুর মুখস্থ হয়ে গেছে। একটা ট্রেন আসবে দশটায়। দশটা বাজবার এখনো দেরী। হাসু রিক্সা-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে যায়। এগারোটার জাহাজে যারা যাবার তারা সাধারণতঃ এখানেই নামে রিক্সা থেকে।

এক ভদ্রলোকের মাল-পত্র নিয়ে দুইজন নম্বরী কুলির মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে। হাসু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

একটা কুলি বলে—আমি আগে ধরেছি।

অন্যটি বলে—ছোড় দো। আপনি কিস্‌কো লিবেন, বাবুজী ?

ভদ্রলোক ফ্যাসাদেই পড়ে যান।

আর একটা রিক্সা এসে থামে। চড়নদার ভদ্রলোকের সাথে ছোট একটা স্যুটকেস ও বিছানা। বোঝাটা বেশী ভারী হবে না। হাসুর মাথার পক্ষে উপযুক্ত বোঝাই। হাসু এগিয়ে যায়। স্যুটকেস ধরে জিজ্ঞাসা করে—কুলি লাগব নি, বাবু?

ঝগড়ায় রত কুলিদের একজন তার প্রতিদ্বন্দী কুলিকে বোঝাটা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে আসে। হাসুকে হাত দিয়ে সরিয়ে বলে—ভাগ্ ব্যাটা।

হাসু নিঃশব্দে সরে যায়। একটা লাইট পোষ্টে পিঠ্ ঠেকিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। রিক্সায় কোন যাত্রী এলে সে আগেই আন্দাজ করে, তার ঘাড়ে কুলোবে কি-না। তার উপযোগী মোট না হলে সে এক পা নড়ে না, লাইট-পোষ্টের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে সে দাঁড়িয়েই থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি বা মোট পাওয়া যায়, তাও নম্বরী কুলিদের ফাঁকি দিয়ে লওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ট্রেন আসছে। দূর থেকে শব্দ পেয়ে হাসু ষ্টেশনে ঢোকে। ট্রেনেই যা কিছু সুবিধা করা যায়। এখানে নম্বরী কুলিদের ফাঁকি দেওয়া যায়। পেছন দিকের গাড়ীগুলোর থেকে মোট নিয়ে সরে পড়লে তারা দেখতে পায় না। কিন্তু এখান থেকে মোট বয়ে রিক্সায় তুলে মোট পিছু দু'আনার বেশী পাওয়া যায় না। পথ কম বলে দু'আনার বেশী আশাও করা যায় না। জাহাজের মোটে পয়সা বেশী। মোট পিছু চার'আনা—এখানকার দুই মোটের সমান। কিন্তু খাটুনিও ডবল।

ট্রেন থামতেই হাসু চট্‌পট্ উঠে পড়ে পেছনের একটা গাড়ীতে। একটা মোট দু' আনায় ঠিক করে। যাদের মাল-পত্র কম, তারা এ রকম ছোট কুলিই খোঁজে। এদের দু' আনা দিলেই খুশী হয়। বড় কুলিরা চার আনার কমে রাজী হয় না।

হাস্থ গাড়ী থেকে নেমে দেখ-না-দেখ সরে পড়ে।

বারোটার মেল ও একটার স্পেশাল জাহাজ ধ'রে হাস্থ রোদে এসে দাঁড়ায়! তার সমান আকারের আরো পাঁচ ছয়টি কুলিও গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আসে। ওভার-ব্রীজের রেলিংএ সকলে সারি সারি গামছা রোদে দেয়।

গামছা প'রে সাঁতার দিয়ে ষ্টীমারে উঠতে হয় তাদের। নম্বরী কুলি ছাড়া জেটীর দরজা দিয়ে অন্য কুলিরা ঢুকবার স্থযোগ পায় না। তারা সাঁতার দিয়েই অনেক সময় ষ্টীমারে ওঠে।

হাস্থ ও অন্যান্য খুদে কুলিরা বসে বসে গল্প করে। একজন একটা বিড়ি ধরায়, তিনজন তার দিকে হাত বাড়িয়ে চেয়ে থাকে, কে কার আগে নিয়ে টান্‌বে।

একজন বলে—শীত লাগছেরে। দে দেহি বিড়িডা। এক্‌টা টান দিয়া লই।

আর একজন বলে—থু-থু, ওর মুখের বিড়ি টানিস না, ছিঃ! ও মেথরের পোলা।

—মেথর বুঝি মানুষ না? রমজান বলে।—পয়সা পাইলে মেথর-গিরিও করতে পারি। চাই পয়সা। রমজান হাতে তুড়ি দিয়ে দেখায়।

জন প্রতি ছুটো করে টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যে ছেলেটি মেথর বলে থুক্ ফেলেছিল, সে এবার বিড়িটা তুলে টানতে আরম্ভ করে।

একটি ছেলে গলা ছেড়ে সিনেমার গানে টান দেয়—মালতী লতা, দোলে—

রমজান হাস্থকে ডাকে—ও দোস্ত, 'উদয়ের পথে' ছাখছেন? 'হংসে' আইছে। চলেন না আইজ। খুব ভালা খেলা।

হাসু বলে—না দোস্ত, মা রাগ করব।

—চলেন না আইজ। তিন আনার পয়সা মোডে। আমার গাঁটের পয়সায়ই না অয় দেখবেন।

—উহুঁ।

রমজান আর পীড়া-পীড়ি করেনা।

রমজান হাসুর বন্ধু ও খুদে কুলিদের সরদার। রমজানকে সবাই ভয় করে। তার কথামত সবাইকে চলতে হয়। তবে হাসুকে খুবই খাতির করে সে।

রমজান বলে—তরগুর তন তোরা আমার লগে এক জাগায় কামে লাগবি।

হাসু জিজ্ঞেস করে—কোন্‌খানে দোস্ত?

—হোসেন দালালের নাম হোন্‌ছেন? নতুন ধনী হোসেন দালাল?

একজন বলে—হা হা, চিন্‌ছি। পাডের দালালি কইর‍্যা বস্তা বস্তা ট্যাকা কর্‌ছে ব্যাডা।

রমজান বলে—হা, হেই হোসেন দালাল। খানপুরে তেতালা দালান খিঁচব এইবার। হেই জাগায় কাম আছে।

—কি কাম?

—ইট ভাঙ্গবি, ইট টানবি, পানি তুলবি। এক ট্যাকা কইর‍্যা রোজ।

সবাই রাজী হয়।

রমজান আবার বলে—আমাকে মাথা পিছু সরদারি দিবি এক আনা কইর‍্যা। গ্যাখ, যদি মনে খাডে লাইগ্যা যা তোরা সবাই।

এখানে সারাদিনে দশ বারো আনার বেশী পাওয়া যায় না। কোনদিন তার চেয়েও কম পাওয়া যায়। সুতরাং কেউ অমত করে না।

ছয়টার ট্রেন ধ'রে হাসু পয়সার হিসেব করে। মাত্র তেরো আনা হয়েছে। একটা টাকার কাজও হল না। কোমরে-বাঁধা জালির

মধ্যে পয়সাগুলো গুঁজে সে এক জায়গায় বসে। হাসুর সাথীরা সব চলে গেছে। রোজ এমন সময় সেও বাড়ীর দিকে পথ নেয়। কিন্তু আজ সাতটার ষ্টীমারটা দেখেই যাবে সে। মা হয়ত বসে থাকবে তার জন্যে। দেরী হলে রাগ করতে পারে। কিন্তু একটা টাকা পুরিয়ে নিলে রাগ না ক'রে সে হয়ত খুশীই হবে।

ছড়ি-হাতে এক ভদ্রলোক হাসুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাত থেকে সিগারেটের শেষাংশ ছুড়ে ফেলতেই হাসু মাটির থেকে তা কুড়িয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করে। দোস্তের পাল্লায় পড়ে কয় দিন হয় সে বিড়ি টানতে শিখেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে বিড়ি টানতে মন্দ লাগে না হাসুর।

সাড়ে সাতটার পরে ষ্টীমার আসতে দেখা যায়। হাসু তিন নম্বর জেটির দিকে দৌড়ায়। গেট বন্ধ হয়ে গেছে। হাসু ফিরে এসে গামছা পরে। লুঙ্গিটা বেঁধে নেয় মাথায়।

ষ্টীমারটা ঘাটে ধরতেই সে সাঁতার দেয়। আজ একা একা তার ভয় করে। অন্য সময় ছয় সাতজন মিলে নদীর জল তোলপাড় করতে করতে তারা জাহাজে ওঠে।

যে-ফ্লাটের গায়ে ষ্টীমারটা ধরেছে তার একটা কাছি বেয়ে বেয়ে সে আগে ফ্লাটের ওপরে ওঠে। লুঙ্গি প'রে গামছার পানি নিঙড়ে সে শরীরটা মুছে নেয়। তারপর ফ্লাটের কিনারার সরু পথ ধরে ধরে ষ্টীমারে উঠবার সিঁড়িতে যায়। ভিড় গলিয়ে এবং নম্বরী কুলিদের চোখ এড়িয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে।

এক মোটা ভদ্রলোক কুলীর সাথে দরাদরি করছেন—চার আনায় যাবে? অল্প মাল আমার, সব শুদ্ধ দশসেরও হবেনা।

—ছয় আনা রেট আছে সাব। কম অইবে না।

—না, যাও। চার আনার বেশী দেব না আমি। কুলিটি চলে যেতেই হাসু এগোয়—কুলি লাগব নি, বাবু?

—লাগবে ত। কত নিবি ?

—আপ্নে খুশী অইয়া যা দ্যান।

—তবে মাথায় নে। চল্ জলদি।

মোট মাথায় নিয়ে হাসু অনুমান করে—কোথায় দশ সের ? স্যুটকেসটার ওজনই বিশ সেরের কাছাকাছি হবে। যেন সীসা ভরা আছে স্যুটকেসটায়। তার ওপর বিছানা। হাসুর মাথায় ভারী লাগে বোঝাটা।

ভদ্রলোক এবার টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজ ও একটি হাতব্যাগ নিয়ে হাসুর হাতে চাপিয়ে দেন।

জেটি পার হবার সময় একজন ডাকেন—অ্যারে রশীদ, তোর জন্যে সাড়ে ছয়টা থেকে অপেক্ষা করছি। তোর বাড়ীতে খবর নিয়ে জানলাম তুই আজ আসছিস।

দু'জনের করমর্দন ও কুশলবার্তার পরে আলম সাহেব বলেন—তোর জন্যে অপেক্ষা করছি কেন জানিস্ ?

—আরে হ্যা-হ্যা। কোথায় বল্ দেখি ?

—'প্যারাডাইসে', হুজ্জতুল্লা আর নির্মল বসে আছে। তুই না হলে যে জমেই না।

রশীদ সাহেব বলেন—যে রকম দেখ্ছি তাতে পাকিস্তানে সোম-রস পান বুঝি আর সম্ভব হবে নারে।

—স-ব বে-রসিক।

আলম সাহেবের সাথে রশীদ প্যারাডাইস কাফেতে গিয়ে উঠেন। হাসুকে বলে যান—তুই বোস এইখানে বাইরে।

হাসু মোট নামিয়ে বসে থাকে। 'কাফের' ঘড়িতে নটা বাজে। কিন্তু সাহেবের বের হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বসে থাক্তে থাক্তে হাসুর বিরক্তি ধরে যায়। একবার মনে হয়—স্যুটকেসটা নিয়ে ভেগে গেলে কেমন হয় ? কিন্তু তারপরেই সে নিজেকে শুধরে নেয়।

রশীদ সাহেব বাইরে এসে চল্‌তে আরম্ভ করেন। হাসু অনুসরণ করে। ওভার-ব্রীজের কাছে আস্‌তে হাসুর পা আর চল্‌তে চায় না। বোঝা মাথায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা খুবই কষ্টকর। ক্ষুধায় হাসুর শরীর দুর্বল। তার ওপর এমন ভারী বোঝা।

হাসু বলে—একটু ধরেন, জিরাইয়া লই।

—চলে আয়। এতটুকুর জন্যে জিরিয়ে কাজ নেই, বাবা ; বেশী দূরে নয়। কাছেই আমার বাড়ী। রশীদ সাহেবের মুখ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বের হয় কথাগুলো।

রশীদ সাহেব না থেমে ওভার-ব্রীজের ওপর দিয়ে এগিয়ে যান। হাসু এক সিঁড়ি দুই সিঁড়ি করে উঠতে থাকে। তার পা কাঁপে। ঘাড়টা চাপ খেয়ে মচকে যাবার মত হয়।

রশীদ সাহেবের আগমনে তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। তাদের আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে বাড়ী-খানা। ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে অন্য দুটির হাত ধরে তিনি অন্দরে ঢোকেন।

একটি চাক্‌রানী এসে হাসুর মাথার মোট নামিয়ে নেয়। হাসু দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে।

রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক। কিন্তু তাকে পয়সা দেওয়ার কথা বোধ হয় মনে নেই কারো।

অনেকক্ষণ পরে হাসু সাহস করে বলে—আমারে বিদায় করেন সা'ব।

রশীদ সাহেবের ছেলে মজিদ হাসুকে ডেকে নিয়ে যায় ভেতরে। রশীদ সাহেব তখন বিরাট বপু বিস্তার করে শুয়েছেন। মজিদকে বল্লেন পকেট থেকে তিন আনা বের করে দিতে।

হাসু আপত্তি করে—তিন আনা কম অইয়া যায় সা'ব।

—কম! বলিস কী? অ্যা!

—জাহাজের তন রিক্সায় উডাইয়া দিলেই ত চাইর আনা দেয়। আর এইডা ত অনেকখানি দূর। আবার দেরী অইল কত।

—নে তোল্ পয়সা।

—না সা'ব। পাঁচ আনার কম নিমু না।

মজিদ বলে—বাপরে! এখান থেকে এখানে পাঁচ আনা! এক মিনিটের পথ না, এত পেলে ত রাজা হয়ে যাবি।

হাসু নাছোড়-বান্দা।

রশীদ সাহেব এবার ডাকেন—এই ছোঁড়া, আয়। পাঁচ আনাই দেব। তবে হাত-পাগুলো টিপে দে ত আমার। ভালো করে তেল-মালিশ করে দে।

—না সা'ব, আমি পারতাম না। আমার দেরী অইয়া গেছে। মা—

—অ্যা, পারবিনে? গর্জে উঠেন রশীদ সাহেব। বিছানার ওপর মেদ-বহুল শরীরখানা দুলিয়ে তিনি বলেন—এমনি এমনি তোমাকে পাঁচ গণ্ডার পয়সা দেব? আমি কণ্ট্রাক্টর। কড়ায় গণ্ডায় কাজ আদায় করে পয়সা দিই। হা-হা-হা।

হাসু রশীদ সাহেবের পায়ের কাছে বসে তার পায়ে তেল-মালিশ করতে শুরু করে।

তেল-মালিশ নেওয়া রশীদ সাহেবের অনেক দিনের অভ্যাস। শোবার আগে রোজ হাত-পা টিপিয়ে না নিলে তাঁর ঘুম হয় না। কলকাতা থাকতে এ-ব্যাপারে সুবিধা ছিল অনেক। চার আনা দিলে আধ ঘণ্টা বেশ হাত-পা বানিয়ে নেওয়া যেত। রাত নয়টার সময় বাসার দরজায় এসে রোজ চীৎকার করে উঠত—মালিশ, তেল মালি—শ।

বাড়ীতে সে-সুবিধা না থাকায় ঝি-চাকর দিয়েই চলে সে কাজ।

দশটা বাজে। পা' টিপতে টিপতে হাসু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মা-র কথা মনে পড়ে। রেল রাস্তার ধারে মা তার পথ চেয়ে আছে। এতক্ষণ

এ লোকটার ব্যবহারে তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তার মনেই ছিলনা। কিন্তু এখন ক্ষুধায় তার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। পেটটা ব্যথা করতে আরম্ভ করে।

মা'র কথা ভাবতে ভাবতে পা-টেপা এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। রশীদ সাহেব বলেন—কিরে, থাম্‌লি কেন? কি টেপা টিপিস? গায়ে কি জোর নেই বাবা? খোট্টারা এ কাজে ভারী ওস্তাদ। কোলকাতায় ভুলুয়া বলে একটা খোট্টা রোজ আসত আমার বাসায়। চমৎকার পারত সে। আর তুই টিপিস, আমার গায়েই লাগেনা। মনে হয় পিঁপড়ে হাঁট্‌ছে শরীর বেয়ে।

কতক্ষণ পরে আবার বলেন – এবার হাতের দিকে আয়।

রশীদ-গৃহিণী চা হাতে থম্‌কে দাঁড়ান। তিনি রুক্ষস্বরে বলেন—ওঃ, সব কাজেই ঠিকেদারী! আচ্ছা, কি আক্কেল তোমার! কার ছেলেকে তুমি এরকম আটকে রেখেছ?

রশীদ সাহেব বলেন—আমার নাম রশীদ কণ্ট্রাক্টর। কড়া-ক্রান্তি পর্যন্ত আদায় করা চাই আমার। এই ছোঁড়া, এবার হাতগুলো টিপে তারপর যাবি।

চায়ের কাপটা রেখে রশীদ-গৃহিণী বলেন—থাক, আর হাত টেপাতে হবে না। কেন তুমি পরের ছেলেকে কষ্ট দেবে?

হাসুর দিকে ফিরে আবার বলেন—আয় ত বাবা। আহা! কার ছেলে গো! তোর কি মা-বাপ নেই?

সহানুভূতির কথায় এবার হাসুর চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে পানি ঝরে।

রশীদ-গৃহিণী হাসুর মুখ দেখে বিস্মিত হন। নিজের আঁচলে চোখ মুছিয়ে তিনি বলেন—দুপুরে খাস্‌নি কিছু? আহা! মুখখানা শুকিয়ে কেমন হয়েছে!

মায়ের মন ক্ষুধাতুর সন্তানের জন্যে ব্যথিত হয়। তাঁর চোখও শুকনো থাকে না।

তিনি হাসুকে খাবার ঘরে নিয়ে যান। একটা থালায় ভাত ও দুটো পেয়ালায় তরকারী দিয়ে হাসুর সামনে এগিয়ে দেন।

ভাতের দিকে চেয়ে হাসুর চোখে ভাসে—মা তার আশায় সন্ধ্যা থেকে বসে আছে। মায়মুন বাড়ীতে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। বাড়ী গেলে রান্না হবে। তারপর খাওয়া হবে সকলের। হাসুর চোখ দিয়ে এবার বেশী করে পানি ঝরতে থাকে।

রশীদ-গৃহিণী বলেন—খেয়ে নে বাছা আমার। কাঁদিস নে আর।

হাসু জোর ক'রে এক মুঠো ভাত মুখে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতরে ক্ষুধার তাগিদ চাপা পড়ে গেছে।

সে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। বলে—আমি যাই।

—কিছুই ত খেলিনে। শান্ত হয়ে খেয়ে এখানেই থেকে যা আজ, কেমন?

—উহুঁ, আমি যাই।

—বাড়ীতে কে আছে তোর?

হাসু কোন উত্তর দিতে পারে না।

রশীদ-গৃহিণী একটা টাকা এনে হাসুর হাতে দেন। অনেক দ্বিধার সঙ্গে টাকাটা নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। রশীদ-গৃহিণী চেয়ে থাকেন ছেলেটার মুখের দিকে। তার মেজ ছেলের মুখের কিছুটা ছাট আসে ওর মুখে।—তখন কলিকাতায় দাঙ্গা। ছেলেটি একদিন তার সাথে রাগ করে সামনের ভাত ফেলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। আর ফিরল না···

হাসু সিঁড়ির গোড়ায় নেমে একবার ফিরে তাকায়। রশীদ-গৃহিণীর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

ঢং-ঢং, ঢং-ঢং—এগারোটার ঘণ্টা। পথে আসতে আসতে হাসু শোনে।

যেখানটায় রোজ কোষা রাখা হয়, সেখানে এসে সে দেখে, মা বসে নেই। কোষাটাও নেই।

মা তার উপর রাগ করেই চলে গেছে। সে বুঝতে পারে।

হাসু অন্ধকারের মধ্যে হাত কচলাতে শুরু করে। রাতটা কোথায় কাটান যায়? দোস্তের বাড়ী অনেক দূর, তাও নদীর ওপারে। এত রাত্রে খেয়া পাওয়া যাবে না।

নিরুপায় হয়ে হাসু কয়েক পা' হেঁটে ছোট রেল-ষ্টেশনটার চালা-ঘরে গিয়ে ওঠে। রাতটা এখানেই কাটানো যাবে। কিন্তু ক্ষুধা পেয়েছে খুব। এত রাত্রে খাবার কিছু পাবারও যো নেই। দু'মাইল হেঁটে চাবাড়া পর্যন্ত গেলে কিছু কিনে খাওয়া যেত। কিন্তু তার এক পা' হাঁটতেও আর ভালো লাগে না।

হাসু বসে পড়ে। যখন বসতেও খারাপ লাগে, তখন এক সময়ে গামছা বিছিয়ে সে শুয়েই পড়ে। শুয়ে শুয়ে সে বাড়ীর কথা মনে করে। মায়মুনকে খাইয়ে মা নিজে না খেয়ে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাব্‌ছে। তাকে না খাইয়ে সে কোনদিন একমুঠো ভাত মুখে দেয়নি, আজও দিতে পারে না। মায়ের কথা ভাবতেই আরো একজনের কথা তার মনে পড়ে। মায়ের মুখের পাশে, মায়ের মর্যাদা নিয়ে যে একখানা মুখ তার চোখের সামনে ভাসে, সে মুখখানা রশীদ-গৃহিণীর।

রাত বারোটার পরে আর কোন ট্রেন নেই। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর ষ্টেশনে আর লোক দেখা যায় না।

সব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দূর থেকে সমবেত চীৎকার ভেসে আসে—আল্লা-আল্লা বল ভাইরে মোমিন—

কোথাও কলেরা-বসন্ত লেগেছে। তার জন্যেই খোদাই শিরনি

হচ্ছে, হাসু বুঝতে পারে। চীৎকার শুনে তার শরীরের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে।

জয়গুন সন্ধ্যার কিছু পরেই এসেছিল। পথ চেয়ে চেয়ে তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে ছেলের ওপর। নয়টার সময় সে নিজেই কোষাটা বেয়ে বাড়ী চলে যায়। তার মনে হয়েছিল—হাসু হয়ত দোস্তের বাড়ী বেড়াতে গেছে।

কিন্তু বাড়ীতে পা' দিয়েই তার ধারণা উল্টে যায়। হাসু তার সে ছেলে নয়। তার কাছে না বলে কোথাও সে যায় না। দোস্তের বাড়ী গেলে তার কাছে বলেই যেত।

জয়গুনের মাথার মধ্যে নানা রকমের দুশ্চিন্তা তাল পাকাতে আরম্ভ করে।—কাল শরীর গরম ছিল, আজ হয়ত জ্বর হয়ে কোন গাছতলায় পড়ে আছে।……পানি সাঁত্রে ষ্টীমারে উঠতে হয়। তবে কি স্রোতে ভেসে গেল?…নদীতে কুমীর থাকে। কুমীরেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়।

জয়গুন কুপী জ্বালে। মায়মুন ভূতের ভয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে আছে। জয়গুন কাঁথা সরিয়ে দেখে মায়মুন ঘুমিয়ে আছে। সে আর মায়মুনকে ডাক দেয় না। এখন ওকে তুল্‌লেই ভাতের জন্যে কাঁদবে। ঘুমিয়ে থাক, সেই ভাল। আজ জয়গুনের চুলো ধরাবার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

খাঁচার নীচে বড় হাঁস দু'টোও দেখা যায় না। বর্ষার দিনে পাতি-শিয়ালে নেওয়ার কথাও নয়। বোধ হয় কেউ ধরে রেখেছে কিম্বা জবেহ্ ক'রে খেয়েছে।

জয়গুনের কাছে সমস্ত দুনিয়াটা এলো-মেলো মনে হয়।

মায়মুনের পাশ দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। এবার দুশ্চিন্তার দুর্বার

স্রোত মাথায় ঢুকবার সুযোগ পায়। জয়গুন ভাবে—তবে কি গাড়ী চাপা পড়ল? হয়ত কিছু চুরি করায় পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

এমনি আরো অনেক চিন্তা তার মনে আসে। একটা কিছুক্ষণ ভাববার পর সেটাকে সরিয়ে আর একটা নতুন দুশ্চিন্তা এসে জাঁকিয়ে বসে মনে।

এগারো

কুউ—ক্কুরু—ত—কু—উ—উ—

মোরগের বাক শুনে জয়গুন আর বিছানায় পড়ে থাকে না। তাড়াতাড়ি উঠে আগে ফজরের নামাজ পড়ে, তারপর মায়মুনকে ডাকে--গা তোল্, মায়মুন। আত-মোখ ধুইয়া জল্‌দি কইর‍্যা চুলা জ্বাল্।

—মিঞা ভাই আসে নাই, মা?

—উহুঁ।

জয়গুন আর কিছু না ব'লে কোষায় ওঠে। অনভ্যস্ত হাতে লগি বেয়ে সে রেল-রাস্তার পাশে আসে।

বিলের শেষ প্রান্তে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য উকি দিচ্ছে।

আবছা আলোয় দূর থেকে জয়গুন দেখতে পায় ষ্টেশনের চালা-ঘরে হাসু গোল হয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে গায়ে হাত রাখতেই হাসু ধড়ফড়িয়ে ওঠে। মা-কে সামনে পেয়ে সে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

জয়গুন দেখে, হাসুর সারা মুখে মশার কামড়ের দাগ। চোখ দুটোও লাল। মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। সে বলে—ডরে ধরছিল, অ্যা?

হাসু মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

—ডরে ধরছিল! কিছু দেখছিলি নি?

—হ। কি ঘুটঘুইড্যা আন্ধার গো, মা! একটা মাইন্‌ষের আলায় নাই। এইখানে ওইখানে এট্টু পরে পরে কিয়ের জানি খচ্‌-খচানি। বিলের মধ্যে কিয়ের যেন্‌ আলো—এই জ্বলে, এই আবার নিবে। আবার কিয়ের বিলাপ হুন্‌লাম। মাইন্‌ষের মতন কান্দে। ডরে আমি এক্কেরে মাডির লগে মিশ্যা আছিলাম। এই আলোগুলা আলৈয়া না, মা?

—যাউক, অই হগল কওয়ন ভাল্‌ না। তোর অহনও ডর করে, অ্যা?

হাসু হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

—না—না, ওগুলা কিচ্ছু না।

পথে আস্‌তে আস্‌তে হাসু কালকের সমস্ত ঘটনা মা-র কাছে বলে। রশীদ-গৃহিণীর দেওয়া টাকাটা মা-র হাতে তুলে দেয়।

বাড়ীর ঘাটে কোষা ভিড়ার শব্দ পেয়ে মায়মুন দৌড়ে আসে। শফী, শফীর মা-ও আসে।

শফীর মা জিজ্ঞেস করে—কোন্‌ খানে পাইলি গো?

—ইষ্টিশনে হুইয়া আছিল।

—ইষ্টিশনে আছিল! একলা! তুই কি নিডুর গো! মা অইয়া কেমুন কইর‍্যা পেডের বাচ্চারে ফালাইয়া চইল্যা আইছিলি!

শফী বলে—দ্যাহ মা, মোখটা কেমুন দর্‌মা দর্‌মা অইয়া গেছে!

—দর্‌মা দর্‌মা অইয়া গেছে!

হাসু বলে—মশার কামড়। সারা রাইত—

বাধা দিয়ে শফীর মা বলে—মশার কামড় না, আর কিছু! তোরা দ্যাখ দেহি ভাল কইর‍্যা চউখ লাগাইয়া। আমি আবার চউখে দেহি না।

জয়গুন ভালো করে দেখে বলে—মশার কামড়ই।

—নালো, আমার কিন্তুক ভালা ঠেকে না। দিনকাল খারাপ।

শেখ-পাড়ায় এক ঘরও বাদ নাই। মোল্লা-পাড়ায়ও দয়া অইছে। আমি এই ডরেই আর খ'রাত করতে ঠ্যাং বাড়াই না ওই মুখী। হোনলাম ছয়জন পাড়ি দিছে।

হাসু শিউরে ওঠে ভয়ে। সে নিজের কানেও শুনেছে খোদাই শিরনি দেওয়ার চীৎকার।

জয়গুন চিন্তিত হয়। বলে—রাইতে ডরেও ধরছিল, ভাজ। আমারও চিন্তা লাগে।

—ডরে ধরছিল!

শফীর মা চম্‌কে ওঠে। সে আবার বলে—তোরা কি কথা কস্! আমার কিন্তু এ'ক্কেরেই ভাল্ ঠেকে না।

—অহন কি উপায় করি, বইন?

—এক কাম কর্। গোসল না করাইয়া ওরে ঘরে নিস্ না। সোনা-রূপার পানি দিয়া গোসল করাইয়া তারপর ঘরে লইয়া যা।

হাসুর মা হাসুকে বলে—তুই অখন বাইরেই থাক্। গোসল কইর‍্যা তারপর ঘরে গিয়া ভাত খাবি। এতক্ষণই যখন থাকৃতে পারলি, এডুকে আর কি অইব? তারপর শফীর মা-কে উদ্দেশ করে বলে—তোমার ঘরে রূপা আছেনি, ভাজ? সোনা ত নাই জানি।

—নালো, বইন। রূপাও নাই। কবে বেইচ্যা খাইছি। আকালে কি আর কিছু রাইখ্যা গেছে! বেবাক ছারখার কইর‍্যা লইয়া গেছে। খালি শফীরে রাইখ্যা গেছে। শফীই আমার সোনা, শফীই আমার রূপা। ও-ই সব। এখন খোদায় মোখ চাইলে অয়।

—খাড়ু জোড়া, হেইও খাইছ? আহা! কেমুন সোন্দর জল-তরঙ্গের খাড়ু ছিল তোমার! আমার এতডি বয়স অইল, ওই রহম খাড়ু আর চউখেই দ্যাখলাম না।

—কত আশা আছিল দিলে! শফীরে বিয়া করাইলে ওর বউরে

দিমু খাড়ু জোড়া। কিন্তুক উদরের টানে তাও দিলাম বেইচ্যা। সোয়ামীর চিহ্নত্ একটা ভাতের কাড়িও রইল না আর।

শফীর মা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

জয়গুন বলে—অখন কোথায় পাই সোনা-রূপার পানি? মোড়ল বাড়ীর বউ-ঝিগ গায়ে রূপার গয়না আছে। কিন্তুক সোনার গয়না ধারে-কাছে কার ঘরে আছে? আমার ত চউখেই পড়ে না।

—ক্যান্, যার আছে হের আছেই। আমাগ মতন পোড়া-কপাল কি আর বেবাকের? খোরশেদ মোল্লার বাড়ীতে আছে। কিন্তুক হেই বাড়ীর লাগা পূবের বাড়ীতেই গুডির ব্যারাম। হ, এক কাম কর্। গদু পরধানের বাড়ীতে গেলেই পাবি। গদু পরধানের বউগ শরীলে গয়নার জিল্লিক মারে। তুই আমার কথা হুন্লে তোর শরীলও আইজ সোনা-দানায় ভরা থাকৃত। আইজগা আর বিচ্রাণ লাগত না।

জয়গুন বিরক্ত হয় শফীর মা-র উপর। সে বলে – চান্দের মইদ্যে ফান্দের কথা ক্যান্ আনো? কেরামতের বউর এক জোড়া সোনার কানফুল দেখছিলাম।

—ইস্! সোনা না আরো কিছু! ক্যামিকল, হুনছি আমি। হেই যে আমার দাদী কইত কথা—দড়ি যদি সাপ অইত আর অজা যদি রাজা হইত। হ, সোনার এক জোড়া মুড়কি আছিল্ জামালের বউর। হেদিন গিয়া দেহি বউর কান খালি। জিগাইলাম, তোমার কান যে খালি, বউ? হে কইল—মুড়কি বেইচ্যা কাপড় কিন্‌চি। কাপড় আগে না গয়না আগে? হাচা কথাই ত। কাপড় না থাকৃলে কি গয়না ধুইয়া পানি খাইব মাইন্‌ষে?

জয়গুন বলে – গদু পরধানের বাড়ীত্ আমি যাইতে পারতাম না। তোমার শফীরে পাডাইয়া দ্যাও। মায়মুনও যাইব সাথে।

শফীর মা বলে—যা শফী, চিল-সত্বর চইল্যা আ'বি। কোনখানে দেরী করিস্ না কিন্তুক।

একটা মেটে ঘটের মধ্যে সোনা ও রূপার গয়না-ধোয়া পানি নিয়ে কয়েক পা এসেই মায়মুন বিস্ময়ের স্বরে বলে—ছ্যাখলা শফী-ভাই? এমুন মোট্টা মোট্টা রূপার গয়না বেডিগো গায়! আবার সোনার গয়নাও আছে।

—তোরে এই বাড়ীতে দিয়া দিমু। এই রহম মোট্টা মোট্টা গয়না পরতে পাবি। কেমুন?

মায়মুন দাঁত বের করে ভেঙচি কাটে, জবাব দেয়—তোমার বউ নিমু এই বাড়ীত্তন্, ঐ যে ছেঁড়ি কোদালের মতন দাঁত—

মায়মুন হাঁসের ডাক শুনে পাশের দিকে চেয়ে দেখে খাঁচায় বাঁধা ছুটো হাঁস, তাদের দিকে চেয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকছে। মায়মুন চিনতে পারে—তাদেরই হাঁস যে! হাঁস ছুটোও মায়মুনকে চিনতে পেরে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

মায়মুন আস্তে আস্তে শফীকে বলে—শফী-ভাই, ছাখছো? আমাগো আঁস ছুইডা বাইন্দা থুইছে।

শফী চোখ ছুটো বড় বড় ক'রে বলে—অ্যা, সত্যই নি!

—কাল রাইতে ওইগুলা বাড়ীত্ যায় নাই।

—বাড়ীত্ যায় নাই? তুই পানির ঘটটা লইয়া কোথায় গিয়া ব'। আমি ফাঁক বুইঝ্যা ছাইর‍্যা দিয়া পলাইমু।

শফী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুযোগের সন্ধানে। গছু প্রধানের শেষ পক্ষের স্ত্রী ওকে দেখতে পেয়ে বলে—কি চাস্‌রে ছেঁড়া ঐখানে?

—কিছু না। সোনা-রূপার পানি নিতে আইছিলাম।

সে চোখের আড়াল হতেই শফী এক টানে খাঁচাটা উল্টে দিয়ে পালায়।

হাঁস দুটোও দৌড়ে গিয়ে পানিতে নামে।

শফী কোষাটাকে জোরে বেয়ে নিয়ে যায়। চকের মাঝে গিয়ে কোষা থামিয়ে মায়মুন ডাকে—চঁই-চঁই চঁ-ই।

পরিচিত কণ্ঠের ডাক অনুসরণ ক'রে হাঁস দুটোকে ধান খেতের আল দিয়ে আস্‌তে দেখা যায়। মায়মুনের ডাক শুনে গছু প্রধানের বাড়ীতেও হাঁস দুটোর খোঁজ পড়েছে। সেই বাড়ীর কুড়ি খানেক ছেলে-মেয়ে বাড়ীর নীচে পানির কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি ছোট মেয়ে চেঁচিয়ে বলে—কতগুলা ধান খাইছে আমাগ! আবার ধরতে পারলে গলা কাইট্যা খাইমু।

শফী লগি উঁচু ক'রে চীৎকার করে—তোর গলা কাটমু।

মায়মুন বলে—হেই ছেঁড়ি। ঐ যে কোদালের মতন দাঁত। তোমার বউ।

মায়মুনের কথায় কান না দিয়ে শফী বলে—আইজ ব্যাডাগুলা বাড়ীত নাই, থাক্‌লে আমাগ গলাই কাইট্যা ফেলাইত রে।

কাছে এলে হাঁস দুটোকে কোষায় তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে মায়মুন।

শফী কোষা বেয়ে বাড়ী যায়।

* *

নিছক মশার কামড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না হাসুর মুখে। দুইদিন বাদেই রমজানের ব্যবস্থা মত সে কাজে যায়।

বিরাট জায়গা নিয়ে দালান উঠছে। হাসুর আনন্দ হয়। কারণ, অনেকদিন এখানে কাজ করা যাবে। এখানে কাজ বেশী। ইট ভেঙে সুরকী করা, ইটের বোঝা টানা, পানি তোলা—এই সব কাজ করতে হয়। ভোরের থেকে বিকেল বেলা পর্যন্ত খাটতে হয়। এক মুহূর্তও বসে কাটাবার উপায় নেই। কিন্তু তবুও হাসুর খারাপ লাগে না।

ষ্টেশনে টো-টো করে ঘোরার চেয়ে এ কাজ অনেক ভালো। এখানে ইচ্ছে-মত বোঝা নেওয়া যায়। কেউ ভারী বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু ষ্টেশনের যাত্রী বাবু-সাহেবরা মাঝে মাঝে এত ভারী বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেন যে, ঘাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। ষ্টেশনে কাজেরও কোন ঠিকানা নেই। পয়সারও কোন ঠিক নেই।
বারো আনার পয়সা প্রায় দিনই হয়ে ওঠে না। কিন্তু এখানে একদিন কাজ করলেই বাঁধা একটাকা। এক পয়সাও কম না। বন্ধুত্বের খাতিরে এক আনা করে সরদারী দিতে হয় না রমজানকে। ষ্টেশনের কাজে আরও কত ঝকমারী। বাবুদের সাথে দরাদরি, ভিড় ঠেলে পথ চলা, সাঁতার কেটে ষ্টীমারে ওঠা—এই সব। এগুলি সহ্য হলেও নম্বরী কুলিদের অত্যাচার একেবারেই অসহ্য।

হাসুর দলের সব ছেলেই এখানের কাজে যোগ দিয়েছে। হাসু শফীকে এনে এখানের কাজে ভর্তি করে দেয়।

শফী একদিন মা-কে বলে—মা, তুমি আর খ'রাত কইর‍্য না। মাইন্‌ষে কয়—

ছেলের মুখের কথা লুফে নিয়ে মাথা নেড়ে শফীর মা বলে—মাইন্‌ষে কয় খ'রাতনীর পুত? হেইয়াতে কি গায়ে ঠোয়া পড়ে? দশ-দুয়ার মাইগ্যা আইন্যা তোরে এতখানি ডাঙ্গর করছি।

জয়গুন বলে—ছেলে তোমার উচিত কথাই কয় গো। ও অহন যাইডের বড় অইছে। রোজগারও করছে। ওর সরম লাগনের কথাই।

—ও রুজি-রোজগার করলে আর আমার ভাবনা কি? আমি খরাত করি কি আমার আমোদে? ঠ্যাঙ্গের জোরও গেছে। শরীলেও তাকত নাই। অহন সারাদিনে এক ও'কৃত খাইয়া আর বইস্যা বইস্যা খোদার শুকুর ভেজতে পারলে বাঁচি।

শফীর মা সেদিন থেকে আর ভিক্ষা করতে যায় না।

বারো

বিকেল বেলা ঘুরে ঘুরে জয়গুন অনেক গন্ধ-ভাদাল পাতা যোগাড় করে আনে। শহরের গিন্নীরা এ জংলী শাকের বড়া খেতে ভালো-বাসেন। পাতাগুলো শুকিয়ে ওঠে বলে রাত্রিবেলা ওগুলো সাজিয়ে ঘরের চালার ওপর রেখে দেওয়া হয়।

রাত্রির শিশির-ভেজা হয়ে ভোর বেলায় পাতাগুলো সতেজ ও সজীব হয়ে ওঠে। রোদ ওঠবার আগে জয়গুন চালার ওপর থেকে চাঙারিটা নামিয়ে নেয়। তারপর বসে বসে চার পয়সার কতটা তা আলাদা আলাদা করে সে চাঙারির মাঝে সাজিয়ে নেয়।

খাওয়া সেরে জয়গুন তুষের হাঁড়ির থেকে আট্‌টা ডিম নিয়ে গন্ধ-ভাদাল পাতার মাঝে বসিয়ে দেয়। তারপর চাঙারিটা কাঁখে নিয়ে হাসু ও শফীর সাথে কোষায় এসে বসে।

সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে কোষা চলে। ধান খেতের দিকে চেয়ে জয়গুনেরও চোখ জুড়ায়। নতুন শীষ মাথা বের করেছে। শীষের ভারে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে ধানগাছগুলি। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বাতাস এসে সবুজ খেতে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে যায়।

জয়গুন বলে—এই বছর খোদায় দিলে ধান অইব খুব। আর না খাইয়া মরতাম না। এই সময়ে বিষ্টিটা রইয়া-সইয়া আইলে অয়। শীষ-মোখে বিষ্টি পাইলে বরবাদ অইয়া যাইব।

হাসু বলে—কেমুন মোট্টা মোট্টা ছড়া বাইর অইছে, দ্যাহ মা! বেবাক জাগায়ই এইবার ভাল ধান অইব। কে যেন কইল হেদিন, ভাডিতে এই বছর খুব ধান অইব। উজান দেশেও হুন্‌ছি খুব বরাদ্দ দ্যাহা যায়।

—অউক। বরাদ্দ অইলেই খাইয়া বাঁচতে পারমু। এইবার পূরা ফসল না অইলে বারোআনা ফসল অইব, অহন যেই রহম ভাও-বরাদ্দ ভাহা যায়। গেল বচ্ছর আধা ফসলও অয় নাই।

শফীর হাতে লগি। সে একটা ধান-খেতের ভেতর কোষা চালাতেই জয়গুন বাধা দেয়—এই কি করস্, শফী! এমুন ভরা খেতের মইদ্দে দিয়া নাও বাইতে আছে?

—ক্যা? এইডা ত আর আমাগ খেত না।

—অলক্ষী ছেঁড়ার কথা হোন্। আমাগ খেত নাই বুইল্যা তুই অমুন ফুলে-ভরা ধানের উপর দিয়া কোষা চালাবি? যা খাইয়া মানুষ বাঁচে হেইয়া লইয়া খেলা! খেতের আল দিয়া যা।

—আল দিয়া গেলে কিন্তুক দেরী অইব।

—অউক দেরী। ধানের ছড়া বাইর অইছে। খেতের মাঝ দিয়া আর যাওয়ন যাইব না। এট্টু টোক্কা লাগলেই কাইত অইয়া পড়ব। আর মাথা খাড়া করতে পারব না।

শফী খেতের আল ধরে কোষা চালায়।

যে খেতে পাট ছিল সেগুলি কচুরী পানায় ছেয়ে গেছে। চার পাশের ধান-খেতগুলিরও অনেকটা জায়গা গ্রাস করেছে কচুরী পানায়। কচুরীর ঝাড়ে বিচিত্র ফুলের মেলা।

দু'একজন নিরলস কৃষক খেতের চারপাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কচুরী পানার আক্রমণ ঠেকিয়েছে।

দু'একটা জলা-খেতে যেখানে কচুরী পানার উৎপাত নেই, সেখানে আধ-বোজা শাপ্লার ফুল। রোদের তেজ বাড়লে বুজে যাবে।

যেতে যেতে জয়গুন বলে—কয়েকটা শাপলা তুইল্যা লইয়া যাই। উকিল বাবুর বউ হেদিন কইয়া দিছিল।

শাপলা তুলে গোটা কয়েক তাড়া বেঁধে নেয় জয়গুন।

একটা ট্রেন সবে মাত্র ছেড়ে যাচ্ছে ষ্টেশন থেকে। হাসু ও শফী দৌড়ে গিয়ে চল্‌তি গাড়ীর হাতল ধরে লাফিয়ে ওঠে পা-দানের ওপর। হাসু চেঁচিয়ে বলে—তুমি ধীরে-হুস্তে আহ, মা। আমরা গেলাম।

জয়গুন শাপলার তাড়া কয়টা কনুইর সাথে ঝুলিয়ে চাঙারি-কাঁখে নারায়ণগঞ্জের দিকে যায়।

মস্‌জিদের মৌলবী সাহেব আস্‌ছেন। তার মুখোমুখী হওয়ায় সঙ্কুচিত হয় জয়গুন। তার হাত দুখানাই আট্‌কা থাকায় সে মাথার কাপড়টাও টেনে দিতে পারে না। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যায় সে। আড়চোখে চেয়ে মৌলবী সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠেন—তওবা, তওবা।

জয়গুনের প্রথম স্বামী জব্বর মুন্‌শী এই মৌলবী সাহেবের খুবই প্রিয় পাত্র ছিল। তার স্ত্রী সদর রাস্তায় হাঁটে, তা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। কতবার লোক পাঠিয়ে তিনি জয়গুনকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু জয়গুন তা শোনে নি।

ডিম ও গন্ধ-ভাদাল পাতা বেচতে বেশী সময় লাগেনা। উকিল পাড়ায়ই আজ সমস্ত কাবার হয়ে যায়। ঝাঁকা নামান মাত্র চিলি-বিলি করে নিয়ে যায় সব।

জয়গুন বাজারে গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ-মরিচ, গরীবের বিলাস-দ্রব্য পান-শুপারী এবং আরো কয়েকটা প্রয়োজনীয় সওদা কেনে। রাস্তার এক জায়গায় আখ বিক্রী হচ্ছে। গাছের সাথে বাঁশ বেঁধে উচ্চতা ও দামের ক্রমানুসারে সারিসারি আখ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মায়মুন কতদিন তাকে বোম্বাই আখ নিতে বলেছে। কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এতদিন নেয় নি, অযথা পয়সা খচর হবে বলে। মায়মুনকে ফাঁকি দিয়ে সে বলেছে—উখের কি খায়? অহনো মিডা অয় নাই। পান্‌সে উখ খাওয়ন আর ঘাস খাওয়ন সমান কথা।

কিন্তু আজ সারিসারি আখ দেখে তার মনে ব্যথা লাগে। সে ভাবে—মওসুমের একটা জিনিস, কার না মুখে দিতে ইচ্ছে হয়? আর মায়মুন ত নেহায়েত কচি মেয়ে।

জয়গুন তিন আনা দিয়ে একখানা আখ কেনে।

রাস্তায় রাজার মা-র সাথে দেখা হয়। রাজার মা জয়গুনের উত্তরে চাল কিন্‌তে যাওয়ার সাথী। সে জিজ্ঞেস করে—কত দিয়া কিন্‌লাগো উখ খান?

—বারো পয়সা।

—বা—রো পয়সা!

রাজার মা মাথায় হাত দেয়। সে আবার বলে—তিন আঙ্গুল উখ না, দাম তিন আনা! উখ ত না—অষুধ। আস্তা পয়সা চাবাইয়া খাওয়ন।

—এই রহমই, বইন। আমাগ ঘরের জিনিসের দর নাই। আমরা যা বেচতে যাই—হস্তা। এক্কেরে পানির দাম। বাজারে একটা আদ্‌না চীজ কিন্‌তে গিয়া ছ্যাহ, গাঁইটের পয়সায় কূল পাইবা না।

একটু থেমে আবার বলে—এই চাঙারির এক চাঙারি শাক, এক্কের তর-তাজা, বেচলাম চাইর আনা। আর ছ্যাহ আষ্ট আনার বেহাতি কোন্ নীচে পইড়া আছে।

—দেখছি বইন। এই ত দশা! এহন যাই গো। দেহি চাউলের নি যোগাড় করতে পারি। আইজ গাড়ীতে ওঠতে পারলাম না। যা ভিড়!

—পুরুষ মানুষই ওঠতে পারে না গাড়ীতে। আমরা ত মাইয়া মানুষ। কাইল-পরশু আবার যাইবা নি গো? গেলে লইয়া যাইও আমারে। ছ্যাশের চাউল্লে পেট ভরে না। চাউলের দাম যেন্ রোজ রোজ ওঠতেই আছে।

রাজার মা এতক্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। জয়গুন হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, আর বুঝি উত্তরে যাওয়া হয় না। লোকের ভিড়ে

গাড়ীতে উঠবার যো নাই। কত লোক হাতল ধরে পা-দানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ীর ছাতে বসে যায় কত লোক। সেদিন তার চোখের সামনে একটা লোক গাড়ীর পা-দানের ওপর থেকে পড়ে গেল।

আবার টিকিটের জন্যও খুব কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বিনা টিকিটে লুকিয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে আর কতদিন যাওয়া যায়? জয়গুনদের গ্রামের জহিরুদ্দিন বিনা টিকিটে গাড়ী চড়ায় তিনদিন ফাটক খেটে এসেছে।

পথে আসতে একটা উদলা নৌকার ওপর জয়গুনের দৃষ্টি পড়ে। রেল-রাস্তার পাশে গাছের সাথে বাঁধা ছোট নৌকাটি। একটি ছোট ছেলে বসে আছে নৌকার ওপর। যে কোন ছোট ছেলে হাতের কাছে পেলেই সে কোলে তুলে নেয়। তার মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। কাসুর নাক, কাসুর চোখ, তার কপাল, ভ্রূযুগল, গায়ের রঙ কেমন ছিল আজও জয়গুনের চোখের সামনে ভাসে। কারও ছোট ছেলে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মন্তব্য করে—ওর নাকটা আমার কাসুর নাকের মতন। আমার কাসুরও এই রহম জোড়-ভুরু। জোড়-ভুরু ভাগ্যমানের লক্ষণ। কিন্তু অইলে কি অইব। যে দশমাস দশদিন উদরে রাখল তার বুক খালি।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে আবার বলে—থাক্, আমি শাপ দিমু না কারুকে। আমার কাসু জান-ছালামতে বাঁইচ্যা থাউক—খোদার কাছে দিন-রাইত চব্বিশ ঘণ্টা এইডাই আরজ করি।

নৌকায় বসা ছেলেটার দিকে চেয়ে জয়গুনের মনে হয়—তার কাসুও এতদিনে হয়ত এতটা বড় হয়েছে।

নৌকাটার দিকে আর একবার চেয়ে দেখে জয়গুন। এ রকম একটা নৌকা করিমবক্শেরও ছিল। নৌকার মাঝে একটা মাছ-মারা কোচও দেখা যায়—ঠিক করিম বক্শের কোচটার মতনই। সে ভালো করে দেখে। তাইত! করিমবক্শের কোচটাই। কোন ভুল নেই।

জয়গুন থম্‌কে দাঁড়ায়। তার মনের মোহনায় আনন্দ ও আবেগের মিলন-সংঘাত আবর্তের সৃষ্টি করে। সে ভুলে যায়, আস্‌মানে না জমিনে, স্বপ্নে না জাগরণে—কোথায় কোন্ অবস্থায় সে আছে।

মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁখের ঝাঁকাটা রাস্তার ওপর ফেলে সে নৌকার দিকে ছুটে যায়।

নৌকায় পা দিতেই ছেলেটি বলে—উইট্যা না আমাগ নায়।

জয়গুন উত্তর না দিয়ে নৌকায় ওঠে।

ছেলেটি বলে—ক্যাদা মাইখ্যা দিলা যে, বা'জান আমারে মারব।

জয়গুনের খেয়াল নেই। সে কাদা পায়েই উঠে পড়েছে।

জয়গুন ছেলেটির কাছে গিয়ে বসে। তার চিবুক ধরে বলে—তোমার নাম কি?

ছেলেটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। মুখ না নামিয়ে আস্তে বলে—কাসু।

—কাসু! কাসু! আমার কাসু! জয়গুন পাগল হয়ে গেল বুঝি! সে দুই হাতে কাসুকে জড়িয়ে ধরতে যায়। কাসু সে হাত সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

জয়গুন ভাবে—আজ সে পেটের সন্তানের কাছে পর হয়ে গেছে।

জয়গুন কাসুকে কোলে নেয়। কিন্তু কাসু 'কোস্তা-কুস্তি' ক'রে কোল থেকে নেমে যায়।

জয়গুন আখ খেতে দেয় কাসুকে। নিজের দাঁত দিয়ে চোক্‌লা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুক্‌রো করে তার মুখে দেয়। কাসু চিবোয়। জয়গুন অশেষ তৃপ্তির সাথে তার দিকে চেয়ে দেখে।

এক সময়ে জয়গুন বলে - তোমার বা'জান কই?

—দুধ বেচতে গেছে।

—তোমার মোখখান হুকনা যে? তোমার মা তোমারে খাইতে দেয় নাই?

—আমার মা নাই। মইর‍্যা গেছে।

জয়গুন সহ্য করতে পারে না। সে তাকে কোলে তুলে নেয়। আম খেতে দেওয়ায় কাসু বশ হয়েছে। এবার কোলে উঠতে আপত্তি করে না। জয়গুন পরম স্নেহে তার কপালে চুম্বন করতে থাকে। তার চোখের জল কাসুর মুখখানা সিক্ত করে দেয়।

কাসুকে কোলে নিয়ে জয়গুনের অনেক সময় কাটে। করিমবক্শ দুধের হাঁড়ি মাথায় নৌকার কাছে এসে কখন দাঁড়িয়ে আছে—জয়গুনের হুঁস নেই। করিমবক্শের ডাকে তার আবেশ ভেঙে যায়। মুখ তুলে দেখে—করিমবক্শ। তার চোখ দুটো রাঙা—জ্বল্ছে।

জয়গুন মাথার কাপড় আরো টেনে দিয়ে দাঁড়ায়। নৌকা থেকে নেমে শিথিল বিবশ পা দুটোয় স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আন্‌বার আগেই করিমবক্শের গম্ভীর গলা শোনা যায়—খাড়, কথা আছে।

জয়গুন দাঁড়ায়। করিমবক্শ বলে—আমারে আর সুখে-শান্তিতে থাক্‌তে দিবি না, দেখতে আছি। মায়ে-পুতে জোট কইর‍্যা আমারে পাগল বানাইয়া ছাড়বি তোরা। হাসুয়া হারামজাদা কদ্দিন জ্বালাইছে। আবার তুইও—

জয়গুন নীরব।

—আমার সুখ তোগ চউখে সয় না? সাত সাতটা বচ্ছর দুধ ভাত খাওয়াইয়া ওরে অত ডাঙ্গর করছি। এখন চাও তৈয়ার আণ্ডায় উম্ দিতে?

জয়গুনের ইচ্ছে হয় বলে—আণ্ডা তুমি পাড় নাই। আমার আণ্ডায় আমি উম্ দিলে তোমার এত পোড়ানি কিয়ের লেইগ্যা? ওরে দশ

মাস দশ দিন পেডে রাখছি, তিন বচ্ছর বুকের দুধ খাওয়াইছি। তুমিই তৈয়ার আণ্ডায়—

কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও সে বল্তে পারে না।

করিমবক্শ আবার বলে— তোগ ডরে ওরে বাড়ীতে রাইখ্যা আহি না। লেজুড়ে লেজুড়ে বাইন্দা রাখি সব সময়। নাওডা চোরে লইয়া যায় এই ডরে ওরে নায় বহাইয়া বাজারে যাই। এদিগেও তোগ উৎপাত শুরু অইছে। আমি এখন কোথায় যাই! তোগ যন্তন্নায় মুল্লুক ছাইড়া বনবাসে গেলে পারি অহন।—করিমবক্শ গুমরে ওঠে।

জয়গুন চল্তে আরম্ভ করে।

করিমবক্শ বলেই চলে—দোহাই খোদার। ওরে ফুস্‌লি দিস্ না আর। আমার পোলারে ফুস্‌লি দিলে আল্লার কাছে ঠেকা থাক্‌বি। রোজ কেয়ামত তক্ দাবী থাক্‌ব তোর উপ্‌রে।

জয়গুন বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে।

করিমবক্শ জোরে বলে—আবার যদি ফেউ-এর মতন আমার পিছু লাগস, আখেরী কথা হুনাইয়া দিলাম, তয় তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

জয়গুন কোনও দিন কাসুকে ফুস্‌লি দেয় নি, আর দিবেও না—সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।

তেরো

মেয়ে লোকটি কে ?

কাসুর মনে বারবার এই প্রশ্নটাই আনাগোনা করতে থাকে।

তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলে। আখ খেতে দিলে। দর্ দর্ করে পানি পড়ছিল তার চোখ বেয়ে। কে সে ?

একবার তার জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু করিমবক্‌শের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা ভেতরেই চাপা পড়ে যায়।

করিমবক্‌শের রাগ তখনও থামেনি। জয়গুন সে-রাগ থেকে কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিল। একত্র ঘর-সংসার করার পুরাতন স্মৃতি করিম-বক্‌শের মেজাজকে চরমে উঠতে দেয়নি। কিন্তু তারপর লগির উপর দিয়ে তার রাগের জের চলে সমানভাবে। লগির জোর গুঁতোয় ধান খেতের মাঝ দিয়ে যেন তীরের মত ছুটছিল তার ডিঙ্গি। ডিঙ্গির গলুইয়ে পানি উঠছিল ছলাত্ ছলাত্। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি এসে লগিটা মটাৎ করে ভেঙ্গে দুই ভাগ হয়ে যায়। করিমবক্‌শের রাগ কিন্তু এতক্ষণে থামে। লগি ভাঙ্গার আপসোসে নয়, তার রাগের জয়লাভে। তার রাগ জয়ী হয়েছে লগিটা ভেঙে দিয়ে। এম্‌নি কোন মাশুল না পেলে তার রাগের কোন মতেই শান্তি আসে না। লগিটা না ভাঙলে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে আঞ্জুমনের সাথে খুব এক চোট ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত ছিল।

বাপের থম্‌থমে মুখের দিকে চেয়ে কাসুর কথা বল্‌বার ভরসা হয় না। চুপ করে সে বসেই থাকে। আর ভাবে—মেয়েলোকটি কে হ'তে পারে ?

প্রশ্নটার মীমাংসায় সেদিন থেকে সে অনেকটা সময় নিয়োজিত করেছে। কিন্তু তার কাঁচা মাথা কোন সন্তোষজনক হদিস খুঁজে বার করতে পারেনি।

হদিস শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

আঞ্জুমন একদিন হাসরের ময়দানের কিচ্ছা বল্‌ছিল। শুনে কাসু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে— হাসরের ময়দানে এত মাইনষের মধ্যে মা-রে চিন্‌তে পারা যাইব? আমি ত মা-রে দেহি নাই। তুমি হেদিন আমার মা-রে চিনাইয়া দিবা?

আঞ্জুমন কাসুর অভিলাষ বুঝতে পেরে ব্যথিত হয়। কাসুর প্রশ্নটা তাকে খুব পীড়া দিতে আরম্ভ করে আজ। সে ভাবে, কাসুকে এমন করে মিথ্যার জালে জড়িয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না। অন্ততঃ তার ত কোনই লাভ নেই লোক্‌সান ছাড়া। কাসু ওর মা-র কাছে চলে গেলেই ভাল হয় যেন। করিমবক্‌শ ফুলিকে মোটেই আদর করেনা। এমন কি 'বা'জান বা'জান' বলে কেঁদে খুন হয়ে গেলেও কোলে তুলে নেয় না। আরো গালাগাল দেয়—মেকুড়ের বাচ্চাডা কান্দে ক্যাঁ? এইডারে ছালা ভইর‍্যা জঙ্গলে ফ্যালাইয়া দিয়া আয়। কাসুই করিমবক্সের কাছে সব। ফুলি যেন তার কেউ নয়।

ভাবতে ভাবতে তার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। সে স্থির করে, আজই কাসুকে ওর মা-র কথা বলে দেবে। জয়গুনের বাড়ী দেখিয়ে দেবে কাসুকে। করিমবক্‌শের ইঙ্গিতে সে এতদিন কাসুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেখেছিল। মা-র কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে সাজিয়ে বল্‌তে হত অনেক কথা। কাসু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল তার মা-র কবরের কথা। আঞ্জুমন কোন দ্বিধা না ক'রে মেহেরনের কবরটাই দেখিয়ে বলেছিল—এই যে এইডা তোর মা-র কবর।

কাসু বিশ্বাস করেছিল, নিঃশ্বাস ফেলেছিল, আর চেয়েছিল এক দৃষ্টে কবরটার দিকে।

মা-র কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সে তন্ময় হয়ে যেত। আর ভাবত—আহা! মা থাকা কত সুখের! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগত সমবয়সীদের

কথা। হামিদের মা হামিদকে কত স্নেহ করে। সেলিমের মা কত আদর করে সেলিমকে। কিন্তু তাকে আদর করবার কেউ নেই।

তারপর থেকে সে প্রায়ই কবরটা দেখ্‌তে আস্‌ত। মাঝে মাঝে করিমবক্‌শের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মোমবাতি কিনে কবরে দিত।

আঞ্জুমন এবার বলে—আমি একটা কথা কইতে পারি। কেওর কাছে না কইতে পারস্।

কাসু মাথা নাড়ে।

—খবরদার, তোর বা'জান হোন্‌লে আমারে কাইট্যা দুইখণ্ড কইর‍্যা ফ্যালাইব। তয় হোন্। অই কবরডা তোর সতাই মা-র। আমি যেমুন সতাই মা, তেমুন।

—আমার মা কে? কাসু উত্তেজিত হয়ে ওঠে।—তুমিই ত কইছিলা, ঐডা আমার মা-র কবর।

—ওহোঁ, মিছা কথা। তোর মা অহনো বাইচ্যা আছে।

কাসু বিশ্বাস করতে পারে না। সে বলে—ফাটকি দ্যাও তুমি।

—ফাট্‌কি দিমু ক্যাঁ? বিশ্বেস না করলে আর কইমু না। থাউক। আঞ্জুমন চুপ করে।

কিন্তু কাসুর শোন্‌বার আগ্রহ এবার বেড়ে যায়। সে বলে—আচ্ছা, এইবার বিশ্বেস করমু। কও তুমি।

—কইলে কি দিবি আমারে?

—তুমি যা চাও হেইয়া দিমু।

—আমি চাই

আস্‌মানী বিরিক্ষির ফল,
তল নাই দিঘীর জল,
যা খাইলে হয় অসুরের বল।

পারবি দিতে?

কাসু বিপদে পড়ে । কোথায় পাবে সে এসব ? আস মানে গাছ হয়, সেই গাছে ফল হয়। কি তার নাম ? সে ত বুঝতেই পারে না কিছু। আর তল নাই দিঘী—সে-টাই বা কেমন ? হতাশায় কাসুর মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। তার ধারণা, এগুলো দিতে না পারলে তার সৎ মা তাকে তার মা-র কথা বলবেই না ॥

আঞ্জুমন খলখলিয়ে হেসে ওঠে। কাসুর পিঠ চাপড়ায়। কাসু এবার ভরসা পায়।

আঞ্জুমন আরম্ভ করে—তোর বয়স তখন তিন বচ্ছর। তোর বাপ তোর মা-রে ছাইড়্যা দেয়। তোরে তোর ফুফুর কাছে পাডাইয়া ছায়। তোর একটা বইন আছে। মায়মুন তার নাম।

কাসুর সন্দেহ দূর হয় না। কিন্তু সে মনোযোগ দিয়ে শোনে সব কথা।

আঞ্জুমন আবার বলে—ঈদে টুপিখান দিছিল কে ? তোর মা দিছিল না ? অই যে কানা বুড়ী দিয়া গেল, ঐ কানা বুড়ী তোর মামানি।

কাসুর সমস্ত সন্দেহের অবসান হয় এবার। সৎ মায়ের আচরণে কাসু কোন দিনই সদিচ্ছার পরিচয় পায়নি। তার হাব-ভাব দেখলে তার ভয়ই হত। আজ সৎ মায়ের সততায় সে বিস্মিত হয়। তাকে আজ খুব ভালো লাগে। আঁচল ধরে আবদার করতেও এখন বাধে না কাসুর।

সে বলে- আমি যাইমু মার কাছে। আমারে লইয়া যাও না মা-র কাছে।

—আমি লইয়া যাইমু কোথায় ? সর্বনাশ ! তোর বা'জান জান্‌তে পারলে আমারে মাইর‍্যা কাইট্যা গাঙ্গে ফালাইয়া দিব। খবরদার ! জান্‌তে যেন্ না পারে।

কাসু মাথা নাড়ে।

আঞ্জুমন বলে—চল্, তোরে দেহাইয়া দেই। বাড়ীর উত্তর ধারে গ্যাহা যায় বাড়ীখান।

কাসুকে নিয়ে আঞ্জুমন বাড়ীর উত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলে—ঐ যে দুইখান বাড়ীর ফাক দিয়া গ্যাহা যায় একটা বড় তালগাছ। ঐ বাড়ীডা। অই খানেই থাকে তোর মা।

কাসু পলকহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার মন এই মুহূর্তে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু নিচে মাঠের দিকে চেয়ে নিরুপায় বলে মনে হয় নিজেকে। আশ্বিনের শেষাশেষি, পানি শুকিয়ে আস্‌ছে। জমির উঁচু আল দেখা যায়। সমস্ত মাঠ কাদায় দৈ-দৈ হয়ে আছে। পায়ের পথও নয়, নায়ের পথও নয়।

করিমবক্‌শ যখন বাড়ী থাকে না, তখন কাসু প্রায়ই বাড়ীর উত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আর নৌকার মাঝে দেখা মা-র মুখখানা মনে মনে চিন্তা করে।

এখান থেকে তালগাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু মাঠের কাদা আর পানি কাসুর সাথে আড়ি করেছে যেন। রোজ এখানে এসে এসে তার রাগ ধরে যায় পানির ওপর। কেন পানি শুকাতে দেরী করছে এত?

দুএকটা লোককে কাদা ভেঙে পথ চল্‌তে দেখে তার মনে হয়, সে যদি এতটা বড় হত তবে সে-ও যেতে পারত অনায়াসে। মাঝে মাঝে কারো কাঁধে চড়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু কে এমন দরদী যে, তাকে কাঁধে করে নেবে?

তালগাছটার দিকে দু'একটা পাখীকে উড়ে যেতে দেখে তারও উড়বার স্পৃহা জাগে। ঐ পাখিগুলোর মত দুটো ডানা যদি তার থাকৃত!

মাঠের কাদা যতই শুকিয়ে আসৃতে থাকে, কাসুর মনও ততই উড়ু

উড়ু করতে থাকে। কার্তিক মাসের শেষে মাঠের মাঝে পথ পড়ে। এমনি সময়ে একদিন শফীর মা আসে এ বাড়ীতে। কাসুর আনন্দ আর ধরে না। এ রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিল সে।

এক প্রহর বেলা। করিমবক্শ গোয়াল থেকে গাইটা বের করে উঠানে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধে। আঞ্জুমন ঝিনুকে করে সর্ষের তেল এগিয়ে দেয়।

করিমবক্শ হুকুম করে—হাম্বাডা লইয়া আয়। বাজারের বেইল অইয়া গেছে।

—আমার ঘিন্ করে। তুমিই যাও।

করিমবক্শ গোয়ালের এক পাশে ঝুলানো হাম্বাটা নিয়ে আসে।

গাইটার বাছুর মরেছে অনেকদিন। দুধ-চোরা গাই বাছুর না দেখলে দুধ ছাড়েনা। কোথায় লুকিয়ে রাখে। বাছুর না দেখালে বাটে হাত দেওয়াও মুস্কিল। পেছনের ঠ্যাং দিয়ে লাথি মারে। এসব অসুবিধার জন্য এই অদ্ভুত ব্যবস্থা। মরা বাছুরটার চামড়ার খোলসে খড়-বিচালি ভরে নকল বাছুর তৈরী করা হয়েছে।

করিমবক্শ হাতে সর্ষের তেল নিয়ে বাটে মাখিয়ে দেয়। তারপর নকল বাছুরটার মুখ বাটের কাছে নিয়ে অনুকরণে গুতো মারে। এ রকম করলে যখন বাটে দুধ নেমে আসে, তখন দুই হাঁটুর মাঝে হাঁড়ি রেখে করিমবক্শ দুধ দুইতে আরম্ভ করে।

—বাছুর কবে মরল, ভাই?

করিমবক্শ চেয়ে দেখে—শফীর মা। নিতান্ত অনিচ্ছার সাথেই সে উত্তর দেয়—মাস তিনেক অইল।

—অনেক দিনই ত অইল। কেমুন কইর‍্যা মরল? দুধে পানি মিশাও বুঝিন্? দুধে পানি মিশাইলে বাছুর মইর‍্যা যায়। এইডা হাচা কথা। শফীর মা ঠাট্টার সুরে বলে।

জয়গুন করিমবক্শের সংসারে থাকতে এ রকম ঠাট্টা-মস্করা প্রায়ই চলত তাদের মধ্যে। বহুদিন বহু ঘটনার তিক্ততার পরেও আজ কেমন করে যে এ ঠাট্টাটুকু জিভ থেকে পিছলে বেরুল, শফীর মা নিজেই বুঝতে পারে না। কথাটা বলেই সে লজ্জিত হয়। করিমবক্শ আপন মনে এ-বাট থেকে ও-বাটে হাত চালিয়ে দুধ নামাতে থাকে। তার মুখেও ভাবান্তর লক্ষ করা যায়।

গাইটা নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ নকল বাছুরটার গা চাট্তে থাকে শুধু শুধু।

আঞ্জুমন পিঁড়ে এনে বসতে দেয় শফীর মা-কে। শফীর মা-র কথার উত্তর সে-ই দেয় এবার—পানি মিশাইব কোন্ দুখ্খে? পানি মিশান বোধ করি ভালা আছিল্। বাছুরেরে দুধ খাইতে না দিলে বাঁচব কেমন কইর‍্যা, কও? ঘাস না চিনতেই দুধের বাছুরের সামনে দিয়া রাখত ঘাস। আর সমস্ত দিন ভ্যা-ভ্যা করত বাছুরডা। বাছুরেরে দুধ খাইতে দিলে যে আড়ি উনা থাকে, বোঝলা নি বইন?

করিমবক্শ খেঁকিয়ে ওঠে—থাম মাগী বেজাত! কুড়ুমের কাছে বিত্তান্ত শুরু করছে। বেশী বকর-বকর করলে দুধের আড়িডা তোর মাথার 'পর ভাঙমু, কইয়া রাখলাম।

শফীর মা বলে—থাউক, বেহান বেলা কাইজা কইর‍্য না গো তোমরা। হাম্বাডা কিন্তু খুব ঢক-সই অইছে। আমি ত ভাবছিলাম জীয়ন্ত বাছুরই। কে বানাইছে? মায়মুনের বাপ তুমি?

অনেক দিন পরে 'মায়মুনের বাপ' ডাকটা শুনে চমকে ওঠে করিম বক্শ। শফীর মা এই বলেই তাকে ডাকৃত। এ পাড়ার সবাই ডাকে 'রহির বাপ' বলে। আঞ্জুমনের বাপের বাড়ীতে ডাকে 'ফুলির বাপ'। শেষের দুটোই চলছে আজকাল। আগের নামটা ঘুমিয়ে গেছে তার মনে।

করিমবক্শ মাথা নাড়ে।

—হ। কারিগরীতে তোমার মত ওস্তাদ আর নাই এই আশে-পাশে।

করিমবক্শের দুধ দোহন শেষ হয়েছে। শফীর মা-কে কথা বলবার অবসর না দিয়ে সে দুধের হাড়ি হাতে উঠে পড়ে।

শফীর মা বলে—আদত কথাটা হোন এইবার।

করিমবক্শ দাঁড়ায়।

—মায়মুনের সম্বন্ধ ঠিক অইছে। আমি কত চেষ্টা-তদবির কইর্যা তয় ঠিক করলাম। না অইলে এমুন সম্বন্ধ কপাল কুটলেও জুট্ত না।

—কোথায় সম্বন্ধ?

—সোলেমানের পোলা, সদাগর খার নাতি ওস্মানের লগে।

—কবে বিয়া?

—এই মাসের এই কয় দিন পর। অগ্রান মাসের নয় তারিখ। তোমার কিন্তু যাইতেই অইব।

—আমি যাইতে পারতাম না।

—এ তুমি কেমুন কথা কও! তোমার মাইয়া, তুমি না গেলে চল্‌ব কেমনে?

তোমার মাইয়া!

করিমবক্শের মনের দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনি করে কথা দুটি। কিন্তু সে উষর মনে বারি-পাতের চেষ্টা বৃথা। কাসুকে ফুসলি দেওয়ার ষড়যন্ত্রের কথা মনের ভেতর টেনে এনে সে নিজেকে কঠিনতর করে তোলে। এবার স্বরটা কঠিন করেই সে বলে—যেদিন থেইকা ওগ বিদায় দিছি, হেদিন থেইকা ওরা আমার কেউ না।

—এ তুমি কি কও, ভাই! তোমার মাইয়া। তুমি না গেলে কেমুন দ্যাহা যায়। কাসুও যাইব তোমার লগে।

—কাসু যাইব!

—ক্যাঁ, দোষ কি ? আবার তোমার লগেই লইয়া আইবা।

—বাহার কথা কইছ। কেউ যাইব না। কাসু যাইব না, এই বাড়ীর একটা পোলাও যাইব না।

—কাসু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। আঞ্জুমনের ইসারায় এবার সে চুপি চুপি সরে যায়।

—কেও না ! শফীর মা আবার বলে।

—হ, হ, কেউ না। বিয়া দিয়া দ্যাও, চাই কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দ্যাও, তাতে আমার কি ? আমি হুঁ-হাঁ কিছু কইমু না।

শফীর মা আর কথার বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না। সে আগেই জানত, মায়মুনের বিয়েতে করিমবক্শকে পাওয়া যাবে না। তবু সে এসেছিল যাতে পরে দূষতে না পারে।

পাশ থেকে কঞ্চির লাঠিটা হাতে নিয়ে শফীর মা ওঠে।

আঞ্জুমন বলে—পান খাইলা না, বইন ?

—নালো বইন। আমি আবার বিনে ছেঁচা মোখে দিতে পারি না। ছেঁচ্‌তে দেরী অইয়া যাইব।

শফীর মা পথ নেয়।

খেতের আলের ওপর কাসু দাঁড়িয়ে আছে। শফীর মা যেতেই তার একখানা হাত ধরে সে বলে—আমি যাইমু, মামানি।

—আমি তোর মামানি কে কইছে ?

—আমি হুন্‌ছি।

কাসু আবার বলে—আমি যাইমু তোমার লগে।

—কই যাবি ?

কাসু কোন উত্তর দেয় না।

শফীর মা বলে—নারে বা'জান। তোরে নিয়া আমি দোষের ভাগী অইমু। শিগ্‌গীর বাড়ীত্ যা। তোর বাপ মাইর‍্যা খুন কইরা ফ্যালাইব।

—উহু, জান্‌তে পারব না। বা'জান দুধ বেচতে যাইব।

—ফুলির মা কইয়া দিব তোর বা'জানের কাছে।

—ওহোঁ, কইব না। হেই ত আমারে চিনাইয়া দিছে ঐ তাল-গাইছ্যা বাড়ীডা।

শফীর মা একটু চিন্তা করে বলে—আচ্ছা চল্। আবার তাড়াতাড়ি ফিরা্যা আইতে অইব। তোর বাপ্ জান্‌তে পারলে কিল এট্টাও জমিনে পড়ব না।

কাসু বলে—বাজার তন ফিরতে দেরী অইব। তার আগেই ফিরা্যা আইমু আমি।

শফীর মা-কে পেছনে ফেলে কাসু এগিয়ে যায়। শফীর মা-ও জোরে পা ফেলে। কিন্তু কাসুর সাথে সে হেঁটে পারে না। সে কতকদুর এগোয় আবার পেছনে তাকায়।

করিমবক্শের বাড়ী ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছে তারা। এবার পেছন দিকে তাকাতেই শফীর মা দেখতে পায়, করিমবক্শ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আস্‌ছে এদিকে। কোনাকুনি ধানখেত মই দিয়ে যেন আস্‌ছে সে। কাসু শফীর মা-কে ছাড়িয়ে নলখানেক এগিয়ে গিয়েছিল।

শফীর মা ডাকে—কাসু! ভয়ে তার গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

কাসু পেছন দিকে তাকিয়ে 'থ' হয়ে যায়।

শফীর মা বলে—ভালা চাস্ ত বাড়ী মুখী পথ দে। নইলে আড্ডি গুড়া কইর‍্যা ফ্যালাইব।

কাসু এসে শফীর মা-কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। তারা দুজনেই ভয়ে কাঁপতে থাকে। শফীর মা-র কাঁপুনি অনুভব করতে পেরে কাসুর ভয় আরো বেড়ে যায়।

করিমবক্শ এসে পড়েছে। দুইহাতে কাসুকে ধরতেই সে আর্ত-চীৎকার করে ওঠে। সে শফীর মা-র আঁচল জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু করিমবক্শ তার রাক্ষুসে থাবায় ছাড়িয়ে নেয় কাসুকে। শফীর মা-কে ধাক্কা মেরে বলে—তুই মাইয়ালোক। নইলে আইজ—

রাগের আতিশয্যে করিমবক্শের মুখ দিয়ে কথার শেষটা বের হয় না। এবার সে কাসুকে বাম কাঁধে ফেলে ডান হাত দিয়ে এক একটা থাপ্পড় মারে আর বলে—আর এই মুখী পাও ফেল্‌বি ? ছাখ্, কেমুন মজা।

কাসু কাঁধের উপর থেকেই হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে থাকে।

করিমবক্শের ধাক্কা খেয়ে শফীর মা বসে পড়েছিল মাটির ওপর। সে অবস্থায়ই সে জিরিয়ে নেয়, আর চেয়ে দেখে করিমবক্শের কাণ্ড।

কিছুদুর যাওয়ার পর আর করিমবক্শকে দেখা যায় না। ধানখেতের আড়ালে পড়ে গেছে সে। এখন সোজা হয়ে দাঁড়ালে করিমবক্শের কীর্তি দেখা যেত। কিন্তু শফীর মা তখনও বসে বসে হাঁপাচ্ছে।

চৌদ্দ

৯ই অগ্রহায়ণ। আজ মায়মুনের বিয়ে। লতিফ মিঞার বাড়ী গিয়ে এই শুভ দিনটি জেনে এসেছিল শফীর মা।

লতিফ মিঞা তার পকেট-পঞ্জিকা বের করে। একটা পাতার ওপর নজর দিয়ে সে আপন মনেই বলে—চন্দ্র রাজা, বুধ মন্ত্রী। তারপর শুভ কার্যের নির্ঘণ্ট দেখে বলে দেয়— অগ্রান মাসের ৯ তারিখে একটা শুভ দিন আছে। আর একটা আছে শেষাশেষি— ২৭ তারিখ। এ ছাড়া অগ্রান মাসে আর দিন নাই।

লতিফ মিঞা তার পঞ্জিকা বন্ধ করে। পঞ্জিকার উপরের রাশিচক্র-অঙ্কিত মলাটের দিকে তাকিয়ে লতিফ মিঞার গণনায় শফীর মা-র একটু সন্দেহও আসে না। সে ভাবে—এমন বই-র গণনা কখনও ভুল হতে পারে না। লতিফ মিঞাকে দাওয়াত করে শফীর মা বিদায় হয়। পথে আস্‌তে সে শুভ দিনটি মনে মনে ইয়াদ করে।

গণনা নির্ভুল সন্দেহ নেই। কারণ এই তারিখে আশে-পাশে আরো অনেক বাড়ীতে বিয়ের ধূম লেগেছে। গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতেও আজ বিয়ে। বাজারে দুধ মাছ কিন্‌তে গিয়ে তা টের পাওয়া যায়। দুধের সের ছয় আনা থেকে বেড়ে এক টাকা হয়। মাছের দর চড়ে হয় দ্বিগুণ। বাজারের অর্ধেক দুধ, ঝাঁকায় ঝাকায় বাছা বাছা রুই-কাতলা মাছ যায় জমিদার বাড়ী।

হাসু ও শফী আসে বিয়ের বাজার করতে। চার সের দুধ, দুটো শোল মাছ, দুটো লাউ আর চাল-ডাল এবং আরো কিছু সওদা নিয়ে তারা বাড়ী আসে।

বাজার ফেরত তিন টাকা ও কয়েক আনা হাসু মার কাছে ফেরত দেয়।

জয়গুন বলে—বারো ট্যাকা যে খতম করলি, আরো ত অনেক খরচ আছে।

শফীর মা বলে—থুইয়া দ্যাও। অত শত দরকার নাই। পনেরো ট্যাকা দিছে মোটে। ওয়াগ ট্যাকা দিয়া ওয়াগ খাওয়াইমু। আমরা খরচ করতে যাইমু কোন্ দুখ্‌খে ?

—গোশ্‌ত অইলে ভালা অইত।

—থুইয়া দে, আবার গোশ্‌ত। আরো পাঁচখান ট্যাকা দিবার কইছিলাম। হেইয়া দিল না, এমুন কিরপিন।

—দিছে পনেরো ট্যাকা। আইব ত ভেড়ার পালের একপাল।

—আহনের কথা দশ জনের। কয়জন আহে, আল্লা মালুম।

—তাইত আমি আগেই কইছিলাম, মায়মুনের বিয়াত ট্যাকা নিমু না। পান-সরবত খাওয়াইয়া বিদায় করমু।

—হেইডা ভালা আছিল্।

—কিন্তুক কেও হোন্‌লানা আমার কথা। অহন ট্যাকা নিয়া বদনামের ভাগী অই।

—তুমি কিচ্ছু চিন্তা কইর‍্যা না, হাসুর মা। শৌল মাছ আর কদু দিয়া একটা ঘণ্ট, ডাইল আর দুধ-বাতাসা, বাস! আবার কি! এ খাইয়া তোর বেয়াই সোলেমান খাঁ তার বউর কাছে গপ্প ছাড়ব। তারিফ করব তোর রান্নার।

জয়গুনের হাসি পায়।

নওশা আস্‌বে সন্ধ্যার পরে। বিকেল বেলায় হাসু ও শফী পাড়া থেকে হোগলা যোগাড় করে দেয় অতিথিদের বস্‌বার জন্যে। উঠানের এক পাশে পা ধোয়ার জন্য পানি-ভরা কলসী ও বদনা রেখে দেয়। তার পাশে রাখে জলচকি ও খড়ম।

সময়টা ভালো। বৃষ্টি-বাদলের ভয় নেই।

সন্ধ্যার পরে বর-যাত্রীরা আসে। দুলাও আর সকলের মত পায়ে হেঁটেই আসে। গরীবের বিয়েতে পাল্কীর কথা কেউ কল্পনা করতেও পারে না। পাল্কীর ভাড়ায় একটা পূরো দস্তুর বিয়ে স্বচ্ছন্দে হয়ে যেতে পারে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে জয়গুন জামাই দেখে নেয়—গোলাপী মাদ্রাজী লুঙ্গী পরনে, গায়ে বেগুনি রঙের পাঞ্জাবী আর মাথায় লাল টুপি। তার মুখের বসন্তের কালো কালো দাগ আর ছাগলে দাড়ি কয়গাছা জয়গুনের কাছে বিশ্রী ঠেকে। বয়স পঁচিশের ওপরে হবে, জয়গুন

অনুমান করে। মেয়েকে নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া আর কি!

জুলা এবং আর যে দু'এক জনের পায়ে জুতো আছে তারা উঠে গিয়ে বিছানায় বসে। বাকী সবাই এক এক করে জলচকির ওপর বসে পা ধোয়। তারপর বিছানার পাশে আর একজনকে খড়ম ছেড়ে মজলিশে এসে বসে।

সকলের শেষে জুতো পায়ে থপ্ থপ্ শব্দ করতে করতে আসে গদু প্রধান। বেঢক চটি জোড়া বিছানার পাশে রাখতে ভরসা হয় না তার। শফীকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—এই খানে রাখলে থাকব ত? না চুরি যাইব?

মজলিশের মাঝ থেকে একজন বলে—গেলই বা চুরি। পুরাণ গেলে নতুন আন্‌বেন।

—তোমরা এখনও নাবালক। জানো পুরাণ জুতা আর পুরাণ চাদরের মম্ম? পুরাণ জুতা-চাদরের সর্মান বেশী।

জুতো জোড়া হাতে করে যেতে যেতে আবার বলে- নতুন জুতা পায়ে দিয়া মজলিশে গেলে মাইনবে কি মনে করে জানো? মনে করে, নতুন শিখ্‌ছে জুতা পায়ে দিতে।

মৃদু হাসির গুঞ্জন শোনা যায়।

গদু প্রধান মসজিদের মৌলবী সায়েবের পাশে জায়গা বেছে নেয়। বস্‌বার আগে জুতা জোড়া পেছনে হোগলার নিচে রেখে দেয়।

গদু প্রধান এসে জুতো চুরির যে প্রসঙ্গ তুলে দেয় তা আর থামতে চায় না। কার বিয়েতে কার জুতো চুরি গিয়েছিল, কার চামড়ার জুতো কার রাবারের জুতোর সঙ্গে বদল হয়েছিল - এ সব গল্প।

সবাই যখন গল্পে মেতে আছে, তখন হাসু এক ফাঁকে লোক গুণে যায়। মা-কে গিয়ে বলে—বেবাকে তেইশ জন, মা।

জয়গুন মাথায় হাত দেয়। সব শুদ্ধ পনেরো জনের আয়োজন করা হয়েছে। এখন কি উপায় করা যায় সে ভেবে উঠতে পারে না। শফীর মা-কে ডেকে বলে—তুমি সামলাও। আমি আর পারি না, বইন।

—কোন চিন্তা নাই। এক কাম কর্। চাইর সের চাউলের ভাত চাপাইয়া দে। আমি ডাইলে দুই বদনা আর দুধে এক বদনা পানি মিশাইয়া দেই। যেমুন মাছ সেমুন বড়ি না অইলে কি দুইন্যা চলে। পাল-বরাদ্দে আইছে যেমুন, খাইব তেমুন ঝুটা পানি।

জুতো চুরির গল্প ছেড়ে কার খেতে কি রকম ধান হবে, কোন্ বিলের ধানে পোকা ধরেছে, কার বছরের খোরাকি হবে, কার হবে না—এ সব আলাপ-আলোচনা চল্‌তে থাকে।

একজন বলে—পরধানের চিন্তা নাই। কম কইর‍্যা পাঁচ ছয় আজার ট্যাকার ধান বেচ্‌তে পারব।

গদু প্রধান চুপ করে থাকে। মজলিশের মধ্যে তার টাকার তারিফ করলে সে খুশীই হয়।

এবার দুলার বাপ সোলেমান খাঁ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে পড়ে। সে বলে— স্বাদীন যে অইল হের কোন নমুনাই যে পাইলাম না আইজও। দিন দিন যে খারাপের দিগেই চল্‌ল। মুসুমের সময়ই চাউলের দর এত, শেষে না জানি কি অয়।

শেষে যদি কিছু হয়, তবে গদু প্রধানের পোয়া বারো। চালের দর চড়ুক, মনে মনে সে তাই কামনা করে।

একজন বলে— দ্যাখ্‌ছ কাপড় পাওয়া যায় না বাজারে। খালি জোলইর‍্যা কাপড়। তাও কুড়ি বাইশ ট্যাকা জোড়া। এ কি গরীবে কিন্‌তে পারে?

গদু প্রধান বলে – আর কিছু দিন পর এও পাইবা না। বউ-ঝিরা ঘরের বাইর অইতে পারব না।

দুলার চাচা লোকমান বলে—কত আশা-ভস্‌সা আছিল্। স্বাদীন অইলে ভাত-কাপড় সায্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাট্‌কি, বেবাক ফাট্‌কি। আবার লেল-গাড়ীর ভাড়াও বাইড়্যা গেল।

—আরো কত ছাখ্‌বা মিঞা, মাত্র বিছমিল্লা। মৌলবী সায়েব বলেন। তারপর গদু প্রধানের কানে কানে কি বলেন।

গদু প্রধান বলে—দশটার মধ্যে বিয়া পড়াইতে অইব। কোথায় সোলেমান? শোন এদিগ্।

সোলেমান খাঁ এলে আস্তে আস্তে গদু প্রধান বলে—তোমার বেয়ান্‌রে আগে তোবা করাইতে অইব।

—ক্যাঁ?

—ক্যাঁ আবার! হায়ানের মত যেইখানে সেইখানে ঘুইর্‌যা বেড়ায়। ছাখ্‌তে পাও না? ভাল্ মাইন্‌ষের মাইয়া। বিয়াও অইছিল ভাল ভাল ঘরে। ভাল জাতের মাইয়া এই রকম বেজাত, বেপর্দা অইলে আমাগই বদনাম। তোবা করাইয়া সইমঝা দিতে অইব। পর্‌চাতে আর যেন বাড়ীর বাইর না অয়।

—হেইডা ত ভালা কথাই।

—তুমি কথাডা মজলিশে উডাও। জোরে জোরে কইও যেন ঘরের তন তোমার বেয়ান হোনতে পায়। আমি আছি তোমার পিছে।

—না, আপনেই উডান। আমার সরম করে।

গদু প্রধান বলে বেশ জোরের সাথেই—বিয়ার আগে বৌর মা-রে তোবা করাইতে অইব। পর্দার বরখেলাপ করে বুইল্যা এখনি তারে তোবা করাইতে অইব। তোবা না করাইলে মৌলবী সাব কলমা পড়াইব না। আর সে ছাড়া কে কলমা পড়ায় আমি দেইক্যা লইমু।

মৌলবী সায়েবের মুখের ওপর মজলিশের সমস্ত চোখ একযোগে

এসে পড়ে। মৌলবী সায়েব এবার একজন বেপর্দা স্ত্রীলোক ও তার স্বামীর কেচ্ছা শুরু করেন।

জয়গুন মায়মুনের চুলের জট্ ছাড়াতে শুরু করেছিল। গদু প্রধানের কথা তার কানে আস্‌তেই সে লাফ দিয়ে ওঠে। শফীর মা-র কাছে গিয়ে বলে—হোন্‌লা নি শফীর মা ?

—হ, হোন্‌লাম। তার কি করতে চাও ?

—কি করতে চাই ? তো'বা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই। মৌলবী সা'ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।

—এইডা কি কথার মতন কথা ? ট্যাকা দিছে তারা।

—ট্যাকা দিছে, পেড ভইর্‌যা খাইয়া ট্যাকা ওসুল কইর্‌যা যাউক। আমি ত আর ট্যাকা সিন্দুকে ভইর্‌যা থুই নাই।

—না, না। ওই হগল কথা রাখ্। এমুন ঘর আর পাবি না। আর আইজ এই রহম কইর্‌যা ফিরাইয়া দিলে বদনামী অইব কত! তোর বাড়ীত্ আর কেও থুক্ ফেল্‌তেও আইব না। আবার গদু পর্‌ধান আছে এর পিছে। ও যেমন-তেমন গোয়ার! ও যদি মন করে উর মাডি চূর করে।

জয়গুন চিন্তিত হয়। তার মুখে কালো ছায়া। সে ভাবে—তওবা করলে ঘরে বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হবে। ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকার অর্থ না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা। জয়গুনের চোখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়। সে তীব্র কণ্ঠে বলে—না, আমি তো'বা কর্‌তাম না।

মজলিশে মৌলবী সায়েবের গলা শোনা যায়। তিনি গল্প বলছেন—ঐ লোকটা তার বেপর্দা স্ত্রীকে কিছুতেই তালাক দিল না। তখন এক জনের ওপর হুকুম হইল—ওরে কতল কর। লোকটারে কাইট্যা ফেলা হইল। আর তার লহু থেইকা পয়দা হইল কি ? না একটা হারাম

জানোয়ার—খিঞ্জির—শুয়োর। এইবার আপনারা গ্যাখেন পর্দা কি চীজ। পর্দা না মান্‌লে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ হইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী সমান।

জয়গুন চম্‌কে ওঠে।

শফীর মা কেরামত ও জহিরুদ্দিন মোড়লকে ডেকে আনে।

জহিরুদ্দিন বলে—মৌলবী সা'ব ঠিক কথাই কইছে, হাসুর মা। তো'বা কইর‍্যা ফ্যাল।

কেরামত সায় দিয়ে বলে—হ চাচি, তো'বা কর।

জয়গুন জ্বলে উঠে—তো'বা কইর‍্যা ঘরে বইস্যা থাক্‌লে আমারে খাওয়াইতে পারবি ?

শান্ত হয়ে আবার বলে—তোমরা ইন্‌সাফ কইর‍্যা কও, তো'বা করলে কে আমারে ঘরে আইন্যা খাওয়াইব ? হাসু যা রোজগার করে ও দিয়া দুই পেট চলে না। মায়মুনেরে আইজ বিদায় দিলেও ওরে নাইয়র আন্‌তে অইব। ও অহন্ তরি শিশু। মাসের মধ্যে দশদিন ও আমার বাড়ীতেই থাক্‌ব। এতগুলা পেট কেমুন কইর‍্যা চালাই তোমরা-ই কও।

জহিরুদ্দিন বলে—খোদায় খাওয়াইব। মোখ দিছে যে, আহার দিব সে।

জয়গুন হাসে শ্লেষের হাসি।

কেরামত বলে—আইজকার দিনডার লেইগ্যা তো'বা কইর‍্যা নেও। তারপর—

—তো'বা তো'বা-ই। একবার করলে তা আর ভাঙতে পারতাম না।

বাহিরে গদু প্রধানের গলা শোনা যায়—অনেক রাইত অইল। কই কেরামত! চালাক্ কর।

—করছি, মিঞা সা'ব।

কেরামত মজলিশে যায়। মৌলবী সায়েব দোর গোড়ায় এসে তাঁর মাথার লম্বা পাগড়িটা খুলে তার এক প্রান্ত কেরামতের হাতে তুলে দিয়ে অন্য প্রান্ত নিজের কাছে রাখেন।

কেরামত ঘরের ভেতর গিয়ে বলে—ধইর‍্যা থাক, চাচি। হুজুর যা যা কইবেন, খেয়াল কইর‍্য। দিলের মধ্যে গাইথ্যা রাইখ্য সব।

দ্বিধার সাথে জয়গুন পাগড়ির মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে। তার মনের মধ্যে তখনও দ্বন্দ্ব চলেছে।

মৌলবী সায়েব টানা সুরে থেমে থেমে কি বলে যান তার একটা কথাও তার কানে ঢোকে না। কেরামত যখন আবার তার হাত থেকে পাগড়ির প্রান্তটা নিতে আসে, তখন তার সম্বিত ফিরে আসে।

এবার খাওয়ার পালা।

জয়গুন তওবা করায় আজ মৌলবী সায়েবেরও খেতে আপত্তি নেই। একদিন তিনি জয়গুনের দেওয়া হাঁসের ডিম ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনের সেই জয়গুন আর এখনকার জয়গুনে তফাত অনেক। একটু আগেও সে মৌলবী সায়েবের কাছে ছিল রাস্তার কুকুরের সামিল।

গদু প্রধান সুমুখের সারির একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে—কিরে আব্দেল, ভাত সামনে কইর‍্যা বইস্যা আছিস ক্যা? খাইতে পারনা বুঝি?

—পারমু না ক্যা? দুধ দিয়া মাইর‍্যা দিমু।

সাদত আলী বলে—আজ কাইলকার ছেঁড়ারা পোয়া চাউলের ভাত খাইতে পারে না। এই বয়সে আমরা লোয়া খাইয়া লোয়া অজম

করছি। খাইতে খাইতে মাজার কাপড় যে কয়বার ঢিলা করতে অইত তার সুমার নাই।

গদু প্রধান বলে—জোয়ান বয়সের কালে একসের চাউলের ভাত অজম করছি আমি।

সাদত আলী বলে—পরধানের মনে আছে? হেই মধু হালইকরের দোকানে তুমি আর আমি বাজী রাইখ্যা রসোগোল্লা খাইছিলাম। তুমি আমারতন ছয়খান বেশী খাইছিলা। আমি খাইছিলাম একচল্লিশটা, আর তুমি—

—আর আমি সাতচল্লিশটা। সাদত আলীর কথা শেষ না হতেই গদু প্রধান বলে।

লেদু পাশ থেকে বলে—রাইখ্যা দাও ওই হগল কিচ্ছা। আইজ কাইলকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না মানে? খাইতে পারে, মিঞা ভাই। কিন্তু খাওয়ায় কে? খাইতে না পারলে ভালই আছিল্। খোদা খোরাক কমাইয়া দিলে ত খুশীই অইতাম। শুকুর ভেজ্তাম খোদার দরবারে। ম'জিদে শিন্নি দিতাম।

লেদুর মাথায় ছিট আছে। কিন্তু তার স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকে তাকে পছন্দ করে। গদু প্রধান কিছু বুঝতে না পেরে বলে—কি রহম?

—বোঝলানা, মিয়া ভাই? তোমার গোলা-ভরা ধান আছে। তুমি এক সেরের বদলে দুইসের খাইলেও তোমার গোলা ঠিক থাক্‌ব। কিন্তু আমি সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রুজি করি পাঁচসিকা। এই ট্যাকা পেডে দিমু, কাপোড় পিন্দ্‌মু, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে। তিনডা বাচ্চা-কাচ্চা আছে। আমার পেড যদি তোমার মতন এক সের খাইতে চায়, তয় উপায়খান অইব কি? সারাদিন খাইট্যা সোয়াসের চাউল গামছায় বাইন্দা ঘরে ফিরি। সাধে কি আর আইজকালকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না। খাইতে পারেনা

না। খাইতে পায়না, কও। মাইন্‌ষের পেড ছোড অইয়া যাউক, খোদার কাছে আরজ করি। বেবাকের পেডে মাজায় লাইগ্যা এক অউক। এক ছডাকের বেশী যেন খাইতে না অয়। এইডা অইলে আর আকাল অইব না দ্যাশে।

অনেকক্ষণ-ধরে-থাকা গ্রাসটা এবার মুখে দেয় লেছু।

তার কথা সবারই ভাল লাগে। শুধু গদু প্রধানের কাছে ভাল লাগে না। সে এবার হাঁক দেয়—অ্যারে, এই খানে ভাতের গামলা লও। ডাইল লও। কেমুন খাদেম, অ্যা! খানেওয়ালা চিন না?

থালার ওপর ঝুঁকে-পড়া ন্যুব্জ-দেহ বৃদ্ধ নাজিমুদ্দিন মাথা উঠিয়ে বলে—লেছুরে আমরা পাগলই কই আর ছাগলই কই, ওর কথা কাঁডায় কাঁডায় সত্য। মাইনষের পেড্‌টা না থাক্‌লে আমি খুশী অইতাম। পেডের জ্বালাই বড় জ্বালা মাইন্‌ষের।

নানা জনের নানা কথার মধ্য দিয়ে খাওয়া শেষ হয়।

সোলেমান খাঁ মজলিশের মধ্যে একটা জায়গায় নিজের কাঁধের গামছাটা বিছিয়ে দেয়। তার চারপাশে কন্যা পক্ষের কেরামত ও জহিরুদ্দিন এবং বরপক্ষের প্রায় সমস্ত লোক কাঁধে কাঁধে মেশামেশি হয়ে বসে। প্রথম সারির পেছনে অল্পবয়সী ছেলেরা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে তাকায় উৎসুক হয়ে।

সোলেমান খাঁ একটা টিনের পুরাতন স্যুটকেস খুলে গয়নাগুলি গামছার ওপর আলাদা করে জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে রাখে। গয়নার মধ্যে বয়লা, গোল-খাড়ু, নাকফুল, কানফুল, নোলক। এগুলো হাত দিয়ে নেড়ে প্রথমেই আপত্তি করে কেরামত—আপনেরা গয়নার জোখা নেন নাই? এত বড় গয়না কে পরব?

—বড় আওয়ন ভালা। বউ আমাগ অহন ডেগা অইলে কি অইব? এক বছর পর যখন সিয়ানা অইব তখন ঠিক কাপা কাপা

অইব। ভাঙ্গা-গড়া করলে রূপা আর রূপা থাকে না। ফুক্কা অইয়া যায়।

আসলে গয়নাগুলো ছিল ওস্‌মানের প্রথম স্ত্রীর। সে মারা যাওয়ার পর চোকা রূপার এই গয়নাগুলোকেই মেজে-ধুয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

জহিরুদ্দিন গয়না হাতে নিয়ে ভালো করে পরখ করে। নাকের নোলক ও নাকফুল ছাড়া আর কোনটাই তার কাছে রূপা বলে মনে হয় না। সে ক্যামিকেলের কানফুল জোড়া এক দিকে সরিয়ে, হাত দিয়ে আর গুলো চোখের কাছে নিয়ে দেখে। কিন্তু বরপক্ষের এত লোকের সামনে কথা বল্‌তে তার সাহস হয়না। সত্যিই যদি রূপার জিনিস হয়ে থাকে, তবে মজলিশের এত লোকের সামনে লজ্জায় কান কাটা যাবে। কেউ হয়ত বলেও বস্‌তে পারে— বাপ্‌-বয়সে রূপা ছাহ নাই কোন দিন ?

ওসমানের প্রথম স্ত্রীর পাটের শাড়ী, একখানা লাল পেড়ে শাড়ী ও গয়নাগুলো ঘরে নিয়ে যায় কেরামত। হাতের বয়লা ও পায়ের গোল খাড়ু সূতো দিয়ে বেঁধে পরিয়ে দেওয়া হয় মায়মুনকে। পাটের দশ হাত লাল শাড়ীটা এমন প্যাঁচিয়ে সামলান হয় যে, দুর থেকে মায়মুনকে দেখে বোঝা যায়না। মনে হয় একটা কাপড়ের পুট্‌লী।

মায়মুন আবদারের সাথে তার মা-কে বলে— মা, তুমি যাইবা না আমার লগে ?

—আমি যাইমু কি করতে, মা ?

—আমি তোমারে ছাইড়্যা কেম্‌নে থাক্‌তাম ?

—ক্যাঁ ? হাসু যাইব, শফী যাইব।

মায়মুন নিশ্চিন্ত হয়।

জয়গুন আবার বলে—তোর চিন্তা নাই। দুই দিনের বেশী

রাখতাম না তোরে পরের বাড়ী। পরশু লইয়া আইমু আবার। এইবার আইট্যা যা দেহি দুয়ার তক, দেহি কেমন দ্যাহা যায়।

মায়মুন উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এত বড় শাড়ীটা সামলান তার পক্ষে কষ্টকর। শাড়ীটা বারবার পায়ের নীচে প'ড়ে তার হাঁটায় বাধার সৃষ্টি করে।

মায়মুনকে দেখে জয়গুনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। এ চোখের পানি সুখের না দুখের বলা শক্ত।

সাক্ষী ও উকিল যখন ঘরে আসে তখন মায়মুন বসে বসে ঝিমুচ্ছে। জয়গুন মাথার কাপড়টা একটু টেনে মায়মুনকে হাত দিয়ে আকর্ষণ করে—একি মায়মুন! ওঠ্ মা, দ্যাখ্ কারা আইছে।

উকিল তখন বল্‌তে শুরু করে—তোমারে সোলেমানের ব্যাটা ওসমানের লগে পঞ্চাশ ট্যাকা দেন্ মোহরে নিকাহ্ দিলাম। তুমি রাজী আছ?

জয়গুন মায়মুনকে বুকে চেপে ধরে। বলে—কও মায়মুন, হ রাজী আছি।

একথা বোঝ্‌বার বা বলবার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই মায়মুনের কাছে। কথা কয়টা তার অনুভূতিকে একটুও নাড়া দেয় না। তোতা পাখীকে শিখিয়ে দিলে সে যেমন বলে, মায়মুনও তেমনি মা-র কথা অনুসরণ করে—রাজী আছি।

সাক্ষী ও উকিল পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসে। জয়গুন এক গ্লাস সরবত মায়মুনের হাতে দিয়ে বলে—নে লক্ষী, গেলাসটা দিয়া দে। উকিল সরবতের গ্লাস নিয়ে সাক্ষীর সাথে বিয়ের মজলিশে চলে যায়।

একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে হচ্ছে বলে একটা ডুলিও পাওয়া যায়নি। বিয়ের পর তাই সোলেমান খাঁ তার ছেলে-বৌকে কোলে তুলে নিয়ে

সকলের সাথে বাড়ীর দিকে পথ নেয়। মায়মুনের ছোট্ট ও পাতলা শরীরের ওজনে সোলেমান খাঁ বিস্মিত হয়। একটা তুলো-ভরা বালিশের মত মনে হচ্ছে তার কাছে। সে মনে মনে চিন্তিত হয়। জোয়ান-মর্দ ছেলের জন্য এতটুকু মেয়ে নেওয়া ঠিক হল না বুঝি। আরো তিন-তিনটি বছর পুষতে হবে ভাত-কাপড় দিয়ে, তবে ছেলের উপযুক্ত হবে বউ। কিন্তু এ তিন বছর—

সোলেমান খাঁ জোর করে চিন্তাটাকে সরিয়ে দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে সে আজকের বিয়ের আনন্দটা মাটি করে দিতে চায় না।

জয়গুনের কাছে আজ সমস্ত দুনিয়াটা ফাঁকা বলে মনে হয়। সে দুবার শুতে গিয়েছিল, দুবারই উঠে এসেছে। ঘুম আসে না।

ভোর রাত্রের দিকে বেশ শীত পড়ে। জয়গুন বাইরে চুলোর পাশে গিয়ে বসে। চুলোর মধ্যে বিয়ের রান্নার আগুন তখনও নিবে যায় নি। জয়গুন ঠাণ্ডা হাত দুটো চুলোর উপর মেলে ধরে। মাথাটাও ঝুকে পড়ে সামনের দিকে। তার চোখ-ঝরা পানি চুলোর আগুনে প'ড়ে অস্পষ্ট ছ্যাৎ ছ্যাৎ শব্দ করে আর সাথে সাথে বাষ্প হয়ে মিশে যায় বাতাসে।

পনেরো

আজকাল করিমবকশ কাসুকে কড়া নজরে পাহারা দেয়। যতদিন মাঠ-ভরা পানি ছিল, ততদিন কালাপানির বন্দীর মত ছিল কাসু। কিন্তু মাঠে পথ পড়ার সাথে সাথে করিমবকশ চিন্তিত হয়। তার মনে আশঙ্কা জাগে—কাসু হয়ত একদিন ফুড়ুত করে ওর মা-র কাছে চলে

যাবে। সেদিন আর একটু আগে দুধ বেচতে বেরিয়ে গেলে সর্বনাশ হয়েছিল আর কি।

করিমবক্শ আঞ্জুমনকে সতর্ক করে দেয়—কানা বুড়ী আমার বাড়ীত পাও বাড়াইলে ঠ্যাঙ্গা মাইর‍্যা খোঁড়া কইর‍্যা দিবা। আমার তিরি-সীমানায় দ্যাখতে পাইলে ওর আর এট্টা চউখ কানা কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু। আমার তুম্‌ড়ীবাজী অহনও দ্যাহে নাই বুড়ী।

আঞ্জুমন করিমবক্শের হৃদয় জয় করার মতলব নিয়ে বলে—বুড়ীরে দ্যাখ্‌লে ভালা মানুষ বুইল্যা মনে অয়। কথাও কয় যেন মিছরির সরবত। দিলের মধ্যে এত কালি কে জানে।

কানাবুড়ীর দোষ কীর্তন করায় আঞ্জুমনের ওপর করিমবক্শ মনে মনে খুশী হয়। কিন্তু সে তাকে বিশ্বাস করেনা। তার সন্দেহ হয়—কাসুর মাথাটা হয়ত ইতিমধ্যেই আঞ্জুমন বিগ্‌ড়ে দিয়েছে। ঘরে-বাইরে এ রকম ষড়যন্ত্র অসহ্য। কোন রকমে মনের গোস্বা মনে চাপা দিয়ে সে কাসুকে পাহারা দেয়। বাইরে গেলেও সে কাসুকে সাথে করে নিয়ে যায়। যেদিন সাথে নেওয়া সম্ভব হয় না, সেদিন গরুর দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে কাসুকে।

কয়েকদিন ধরে ধান কাটার ধূম পড়েছে। করিমবক্শ তার নার-কেলের হুকোটা কাসুর হাতে দেয়, আর আগুনের মাল্‌সাটা নিজের হাতের তালুতে বসিয়ে অপর হাতে দুটো কাস্তে নিয়ে মাঠে রওনা হয়।

কাসুর হাতে একটা কাস্তে দিয়ে বলে—আমার লগে থাইক্যা ধান কাটতে শিখ। বড় অইলে এই কইর‍্যা খাইতে অইব।

কাসু তার ডানহাতের ছোট্ট মুঠোর মধ্যে কাস্তের মোটা হাতল ভালো করে সামাল দিতে পারে না। কোন রকমে হাতলটা চেপে ধরে সে দু'একটা করে ধানের ছড়া কাটতে আরম্ভ করে।

মাঠের আরো অনেক জমিতে ধান কাটা শুরু হয়েছে।

দূরের একটা জমি হতে কৃষাণদের সমবেত গান ভেসে আসে—

কচ্-কচা-কচ—কচ্-কচা-কচ
ধানরে কাটি,
মুঠা মুঠা ধান লইয়া বান্দি আটি—রে।
(ও ভাই) ঝিঙ্গা শাইলের হুড়ুম ভালা,
বাঁশ ফুলেরি ভাত ;
লাহি ধানের খইরে ভালা,
দইয়ে তেলেসমাত—রে।
কস্তুর গন্ধীর চাউলরে আলা,
সেই চাউলেরি পিঠা ভালা,
সেই না পিঠায় সাজিয়ে থালা
দাও কুটুমের হাত—রে।
আহ্লাদি বউ কোটে চিড়া
মাজায় রাইখ্যা হাত,
সেই না চিড়ায় কামড় দিয়া
বুইড়ার ভাঙে দাঁত—রে।
মিঞা বাড়ী ঘটক আসে
কন্যা-বিয়ার কথার আশে,
বোরো ধানের ভাত খাইয়া সে
মিঞার মারে জাত—রে।

পাশের একটা জমিতে আলোচনা হচ্ছে। একজন বলে— আমরা হেদিন বৈডকে ঠিক করলাম, সাতভাগা অইলে কেও ধান কাটতাম না। কিন্তুক দ্যাখ্ ছমিরদ্দির দল সাতভাগায় গদু পরধানের ধান কাটতে শুরু করেছে।

আর একজন বলে—আবার গানও লাগাইছে ফুর্তির ঠেলায়।

—হেইয়া করব না। বেডা বেয়াক্কেলরা এডুকও বোঝে না, এই বারের যেই ধান, তা সাত ভাগের এক ভাগ নিয়া কি ওগ বাপ-মার ফাত্তা করব ?

—এই বচ্ছর যে ধানের অবস্থা এই রহম অইব কে কইছিল ? যুইতের ধান অইলে না অয় সাত-ভাগায় কিছু অইত। কিন্তুক একটা ধানের ছড়ার মইধ্যে চাইর আনাই মিছা।

বর্ষার সময় ধানগাছের রকম দেখেই অনেকেই অনেক আশা করেছিল। কিন্তু সবুজ ধান যখন সোনালী রঙ ধরতে শুরু করে, তখন চাষীরা ধানের ছড়া দেখে মাথায় হাত দেয়। এক একটা ছড়ার মধ্যে চার আনা ধানই অপুষ্ট ও চালশূন্য চিটে। এখানে সেখানে ধানগাছ মরে যাওয়ায় জমিগুলি টাক-পড়া মাথার মত হয়ে আছে।

করিমবক্শ কয়েক 'ঘোপ' কেটে আলের ওপর এসে পা ছড়িয়ে বসে। পাশের জমি থেকে ধানকাটা রেখে লেদু মিঞা আলের দিকে আসতে আসতে বলে—ভাল কইর‍্যা তামুক সাজ, চাচা। একটা দম দিয়া যাই।

করিমবক্শ বাঁশের ডিবা হতে তামাক নিয়ে সাজতে থাকে। অদূরে বসে কাসু ধানগাছের ডগা দিয়ে বাঁশী তৈরী করার চেষ্টা করছে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটা বেশী দূরে নয় এখান থেকে। গাছটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

লেদু বলে—কাসুরে এই মাথা-ফাডা রউদের মইধ্যে লইয়া আইছ ক্যাঁ, চাচা ? ওরে বাড়ীত্ রাইখ্যা আইলেই পার।

—এহন এট্টু আধটু রউদ মাথায় না নিলে অইব ক্যাঁ ? নোয়াব সাইজ্যা বইয়া থাকলে ত কাম অইত না। আর এই শীতের মিডাম রউদে তেজ নাই।

—তেজ নাই। তয় বড় শুকনা রউদ। গ্যাহনা চউখ-মোখ কেমুন টানতে শুরু করছে।

কাসুর হাত থেকে ধানগাছের নলটা নিয়ে লেদু বলে—দে, আমি বানাইয়া দেই।

বাঁশী তৈরী করতে করতে লেদু বলে—মাইয়ার বিয়াতে গেলানা যে, চাচা? তোমার পরাণ কি দিয়া বানাইছে খোদায়? পাথ্থর না পোড়া মাডি দিয়া, কও দেহি। মায়া-দয়া কি এক্কেরেই নাই তোমার পরাণে? কাসুর মা—

করিমবক্শের ভ্রূকুটি ক্ষণেকের জন্য লেদুর মুখ বন্ধ করে রাখে। সে কাসুর দিকে বাঁশীটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার শুরু করে—তুমি অমুন কর ক্যা, চাচা? কাসু বড় অইয়া ওর মা-রে বিচ্রাইয়া—

করিমমবক্শ সাজানো কল্কেটা হুঁকোর মাথায় না বসিয়ে ছুঁড়ে মারে লেদুর দিকে, চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ কর শয়তানের বাচ্চা। ইয়ার্কির জা'গা পাও না? মানুষ চিন না তুই?

লেদু ঘাড় নীচু করে আত্মরক্ষা করে। তার মাথার ওপর দিয়ে শো করে কল্কেটা ধানগাছের ছোপের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

আশে-পাশের জমি থেকে কৃষাণরা ছুটে আসে—কি অইল? কি অইল?

লেদুই বলে—কিছুই না। যাও তোমরা।

লেদু কল্কেটা তুলে গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বলে—রাগ করলা নি, চাচা? আর কোনদিন কিচ্ছু কইমু না। এই কান ডলা খাইলাম দশবার।

করিমবক্শ তখনও রাগে গর গর করছে।

লেদু নিজেই এবার তামাক সেজে হুঁকোটা করিমবক্শের হাতে দেয়। তারপর বলে—তোমার জমিনে এইবার ধানে বরাদ্দ নাই। আমাগ লগে ধান কাটতে যাইবা? খুরশীদ মোল্লার বটতলার খেতে ধান মন্দ অয় নাই। দিবও ছয়-ভাগা।

করিমবক্‌শের রাগ থামে। তার বদমেজাজের জন্য কেউ তাকে দলে নিতে চায় না। লেদুর এ প্রস্তাবে সে খুশী হয়। বলে—কবে যাইবা তোমরা ?

—এই জমিনের ধান কাডা অইলেই। তুমিও তোমার জমিনের ধান কাবার কর।

—কাবার আমার কাইলই অইব। পাতলা পাতলা ধান কাট্‌তে দেরী লাগে না। এইবার তিনডা মাসের খোরাকীও অইব না। গেল বছর ছয় মাসের ধান পাইছিলাম। এহন তোমরা যদি দলে নেও তয়ই না বাঁচতে পারমু।

—তোমারে দলে নিতে ত আপত্তি নাই। আপত্তি কিয়ের লেইগ্যা জান ? তোমার মেজাজের লেইগ্যা দলের কেও রাজী অয় না। যাউকগা, আমি বেবাকেরে বুঝাইয়া ঠিক কইর‍্যা নিমু। তুমিও তোমার মেজাজখান ঠাণ্ডা কর। আর এট্‌টু অইলে আইজ আমার মাথাডা ফাডাইয়া দিছিলা আর কি ?

করিমবকশের নিজের জমির ধান কাটা শেষ হয়েছে। খুরশীদ মোল্লার বটতলার খেতে ধান কাটতে যাবে সে। কিন্তু কাসুকে আর পেছনে টানতে ভাল লাগে না। বটতলার খেত অনেক দূর। রোদের মধ্যে এত দূরে নিয়ে ছেলেটাকে বসিয়ে কষ্ট দেওয়া তার ইচ্ছে নয়। এ কয়দিনে ছেলেটা শুকিয়ে গেছে। তার চোখ-মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। আর যে ভয়ে সে কাসুকে সাথে সাথে নিয়ে বেড়ায়, সে ভয় সব জায়গায়ই দেখা দিয়েছে। কাসুকে ওর ফুফুর বাড়ী থেকে নিয়ে আসার পর যতগুলি ঘটনা ঘটেছে তাতে কাসু হয়ত অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছে। তবুও সে সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাজার থেকে বিস্কুট, জিলিপি, কদ্‌মা এনে কাসুকে খেতে দেয়। নিত্য-নূতন খেল্‌না দিয়ে

তাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। কোন লোককে ওর কাছে ঘেঁষতে দেয় না, পাছে কেহ ওর মা-র কথা বলে দেয়।

কাল পান্তা ভাত খেয়েই করিমবক্‌শ ধান কাটতে যাবে। কিন্তু কাসুকে বাড়ীতে রেখে যেতে তার মন সরে না। আবার তার সাথে নিয়ে গিয়েও কোন লাভ নেই। সেখানেও উস্কানি দেওয়ার লোক আছে যথেষ্ট। জয়গুনের বাড়ীর কাছের কেরামত আছে লেছুর দলে। কে কখন কোন তাল দিয়ে বসে বলা যায় না। সে ভাবে—তাল দিতে পারে সব্বাই, 'মিডাই' দিতে পারে না কেউ।

মহা সমস্যা করিমবক্‌শের সামনে। চিন্তা ক'রে সে কোন সমাধান খুজে পায় না। আঞ্জুমন তামাক দিয়ে যায়। তামাক টান্‌তে টান্‌তে সে চিন্তা করে। তার চিন্তা তামাকের ধোঁয়ার সাথে কুণ্ডলি পাকাতে আরম্ভ করে।

এক সময়ে হুঁকোয় টান দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় করিমবক্‌শ। তারপরই তার চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠে।

হুঁকোটা বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে রেখে সে এক লাফে বেরিয়ে পড়ে।

পাশের বাড়ীর হারুনকে ডেকে চুপি চুপি যুক্তি করে দুই জন।

হারুন বলে—সাদা চুল পাইমু কই ?

—আমি যোগাড় কইর‍্যা দিমু। তুই এট্টা সাদা কাপড় যোগাড় করিস। আর খবরদার, কেও যেন্ না জানে। তুই আর আমি, বুঝলি কথা ? কান অইলেই সর্বনাশ।

একটু থেমে আবার বলে—আমার কাম যদি ফতে অয়, তয় তোরে একখান গামছা কিন্যা দিমু।

করিমবক্‌শ সন্ধ্যার সময় কাসুর কোমরের দড়ির বন্ধন খুলে দেয়। কড়া পাক-দেওয়া গরুর দড়িটায় দাগ বসে গেছে কোমরে। করিমবক্‌শ

আদর করে ডাকে—কাসু, অ কাসেম! চল্ বা'জান, তোরে টিয়া-পক্ষীর বাচ্চা ধইর‍্যা দিমু। ওই তেঁতুইল গাছে টিয়ার বাসা আছে।

কাসু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

—চল্ আমার লগে।

করিমবক্শ কাসুর হাত ধ'রে তেঁতুল গাছের দিকে নিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে করিমবক্শ বলে—আমারে বা'জান কইয়া ডাক দে।

দীর্ঘ চার বছর কাসু ফুফুর বাড়ী কাটিয়েছে। কেউ তাকে ঐ নামে ডাকতে শেখায় নি। অনভ্যস্ত ব'লে এখন বা'জান ডাকতে কাসুর লজ্জা হয়। বাপের কাছে এসে সে আদর-স্নেহ যা পেয়েছে, তার চেয়ে মার-ধর খেয়েছে ঢের বেশী। করিমবক্শ ছেলের কাছে পিতার উপযোগী কোন ভক্তি-শ্রদ্ধাই অর্জন করতে পারেনি। সে যা অর্জন করেছে তা ভয়। কিছুটা ভয় আর বেশীর ভাগই লজ্জায় কাসু বা'জান ব'লে ডাকতে পারে না। এজন্য কতদিন মারও খেয়েছে। মার খেয়ে অনিচ্ছায় উচ্চারণ করেছে কয়েকবার। কিন্তু মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে শব্দটি কোনদিন বের হয় নি।

করিমবক্শ আবার বলে কিরে, ক। না কইলে টিয়াপক্ষীর বাচ্চা দিমু না।

এত লোভ দেখানো সত্ত্বেও কাসু মুখ বুজে থাকে। কোন কথাই বের হয় না মুখ দিয়ে। করিমবক্শ আর পীড়াপীড়ি করে না।

তেঁতুল গাছের কাছাকাছি যেতেই কি রকম এক গোঙানির শব্দ শুনে কাসু থমকে দাঁড়ায়।

করিমবক্শ বলে—কিরে, কি অইল?

—অইডা কি ছ্যাহা যায়? তেঁতুইল গাছের টিকিতে বইয়া রইছে।

করিমবক্শ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে—সত্যই ত! পাক্না চুল ছাইড়্যা দিয়া বইয়া রইছে। আবার গোঙায়!

করিমবক্শ চোখ দুটো বড় ক'রে বলে—খাড়া, দেইখ্যা লই।

কাসু এবার করিমবক্শের হাত ধ'রে তার গায়ের সাথে মিশে দাঁড়ায়। করিমবক্‌শ কাসুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

—কাসু, শিগ্‌গীর আমার কোলে ওঠ্। বাপ্‌রে বাপ! এইডা ত আর কিছুনা। এইডা যে গোঙাবুড়ী। গলা টিপ্যা ধরব। আল্লা, আল্লা, বাঁচাও। আল্লা, আল্লা। কাসু, আল্লার নাম কর্। আল্লা, আল্লা।

কাসু করিমবক্শের বুকের মধ্যে মুখ লুকায়। ভয়ে চোখ বন্ধ করে। কাঁপে থর থর ক'রে। করিমবক্শ কাসুকে কোলে নিয়ে দৌড় দেয়। বাড়ী এসেও কাসু চোখ খোলেনা।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে করিমবক্শ বলে – কাসু, আমারে বা'জান কইয়া ডাক দে। বা'জান না ডাকলে গোঙাবুড়ী ডাক দিমু।

অন্ধকারের মধ্যে শিউরে ওঠে কাসু। করিমবক্শকে জড়িয়ে ধরে দুই হাতে। তার চোখের সামনে তখনও যেন সে দেখছে গোঙাবুড়ীর বিকট মূর্তি।

করিমবক্শ কাসুকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ভান ক'রে বলে—সইর্যা যা আমার কাছ তন। আমারে বা'জান না কইলে এহানি গোঙাবুড়ী ডাক দিমু।

কাসুর ভীত-কম্পিত কণ্ঠ অস্ফুট শব্দ করে—বা'জান।

করিমবক্শ সাড়া দেয়। তারপর বলে—কাসু, বাড়ীর বাইরে যাইস্ না কিন্তুক, খবরদার। ঐ গোঙাবুড়ী গলা টিপ্যা ধরব। তেঁতুইল গাছে আরো একটা পিচাশ আছে। হেইডার নাম ছালাবুড়ী। ঐ যে হেদিন কানা এক বুড়ী আইছিল ঐ রহম দেখতে। ছালাবুড়ী ছালার মইদ্যে ভইর্যা তোর মতন ডেগা পোলা পাইলে লইয়া যায়। তারপর তেঁতুইল গাছে বইসা বইসা রক্ত খায়।

কাসু করিমবক্শের বুকের মধ্যে শিউরে ওঠে। তার কাঁপুনি করিমবক্শও অনুভব করতে পারে।

সে আবার বলে—খবরদার। কানাবুড়ীর সুরত ধইর‍্যা ছালাবুড়ী ধইর‍্যা লইয়া যাইব।

করিমবক্শ তার অদ্ভুত ফন্দির সফলতায় মনে মনে খুশী হয়। কাসুকে বাড়ীতে রেখে এখন নিশ্চিন্তে কাজ করা যাবে। কাসু ভুলেও জয়গুনের বাড়ীর দিকে পা বাড়াবে না। কারণ পথের উপরেই তেঁতুল গাছ। আবার ছালাবুড়ীর চেহারা নিয়ে কানা বুড়ীও এসে আর সুবিধে করতে পারবে না।

*　　*　　*

করিমবক্শের মতলব হাসিল হয়েছে। কাসু এখন আর বাড়ী থেকে বের হয় না। আগে বাড়ীর উত্তর পাশটায় গিয়ে দাঁড়াত সে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর তাল গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে সে অনেক সময় কাটিয়ে দিত। রোজ ঐ তালগাছটা দেখে দেখে সে তার মা-র চিন্তাটাকে তাজা ক'রে নিত মনের মধ্যে। মা-র অভাব তাতে অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ত। তেঁতুল গাছে গোঙাবুড়ী দেখার পর সে আর কোন দিকে পা বাড়ায়নি।

সে কখনও ফুলির বিছানার পাশে, কখনও উঠানে, কখনও বা রান্না-ঘরে তার সৎমা-র পাশে ব'সে কাটিয়ে দিত। এমন কি গোয়াল ঘরের পাশে যেতেও তার সাহস হত না।

মা-র মধুর চিন্তা তার মনে বার বার যে ছাপ রেখে গেছে তা কখনও মুছবার নয়। সে স্থায়ী ছাপকে এখন ভূতের বীভৎস মূর্তি যেন রাহুর মত গ্রাস করেছে। গোঙাবুড়ীর গোঙানি, ছালাবুড়ীর ছালা, তাদের নখর ও দাঁতের এলোমেলো কল্পনা কাসুকে সব সময়ে সন্ত্রস্ত করে রাখে। কোন ঠুং-ঠাং শব্দ শুন্‌লেই সে ভয়ে অস্থির হয়। রাত্রে ঘুমের

ঘোরে সে চীৎকার ক'রে উঠে। করিমবক্শ সে চীৎকারে সজাগ পেয়ে কাসুকে জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞেস করে—কি কাসু, অমুন করস্ ক্যাঁ?

কাসু কোন উত্তর দেয় না। করিমবক্শের বুকের মধ্যে গিয়েও সে কাঁপে থর থর ক'রে।

হঠাৎ একদিন কাসুর জ্বর হয়। প্রথম দিন-দুই করিমবক্শ মোটেই গা করে না। তিন দিনের দিন বেশ তোড়-জোরের সাথেই জ্বর ওঠে। বিছানায় পড়ে পড়ে কাসু প্রলাপ বকে।

করিমবক্শ দাওয়ায় ব'সে মাটির ওপর আঁচড় কেটে বাকী খাজনার হিসাব করছিল। সে ঘরের মাঝে উঠে এসে বলে—কাসু, ও কাসু! কি অ্যাঃ? অমুন করস ক্যাঁ?

—ছালাবুড়ী আইল। উঃ—উঃ—উঃ। না—না। বা'জান কইতাম না।

করিমবক্শ কাসুর মাথায়, কপালে হাত দিয়ে দেখে। হাত রাখা যায় না। মনে হয়, পুড়ে যাবে হাত।

—মা, মা, মাগো, মা।

করিমবক্শ বলে—ম্যাঁও ম্যাঁও করস ক্যাঁ? আল্লা আল্লা কর্। আল্লায় রহম করব!

কাসুর হুঁস নেই। সে কখনও বিড় বিড় করে, কখনও বা টানিয়ে টানিয়ে বক্‌তে থাকে।

করিমবক্শ আরো একদিন দেরী করে। কিন্তু কাসুর জ্বর বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

করিমবক্শ উদ্বিগ্ন হয়। সে তাড়াতাড়ি ক'রে ফকির বাড়ী যায়। গ্রামের সেরা ফকির দিদার বক্শ এসে হাতের লাঠিটা বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে রেখে কাসুর বিছানার পাশে বসে।

কাসু প্রলাপ বক্‌ছে—ওইডা কি? তেঁতুইল গাছ—

কিছুক্ষণ বসে থেকে দিদার বক্শ চোখ বুজে ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চাপ দিয়ে বিজ্ঞের মত কয়েক বার মাথা নাড়ে। তারপর গাম্ভীর্যের সাথে বলে—আর ছাখ্তে অইব না। মোখ দেইখ্যা আগেই আমি বোজতে পারছি।

করিমবক্শ উদ্বেগ-ভরা কণ্ঠে বলে—কি, পাগল-ভাই ?

দিদার বক্শকে সবাই পাগলা দিদার বলে।

সে বলে—আবার কি! কথা হুইন্যাও মালুম করতে পার না ? হ্যাহ না কেমুন বিলৃকি-ছিলৃকি কয় ?

—আমিও আগেই মালুম করছি কিছুডা। সব সময় খালি কয় গোঙাবুড়ী আইল। গলা টিপ্পা ধরল। আল্লা-খোদার নাম নাই মোখে। আর কেবল ম্যাঁও ম্যাঁও করে। আমার দাদার মোখে হুনছি, ভুতে পাওয়া মানু আল্লার নাম ভুইল্যা যায়। এহন কি করা যায়, পাগল-ভাই ?

—কিছু চিন্তা নাই। হোন, একখান ন্যাকৃড়া লইয়া আহ। আর এক চামুচ কড়ু তেল।

করিমবকৃশ ফকিরের নির্দেশ মত ন্যাকড়া ও সর্ষের তেল নিয়ে আসে। ন্যাকড়া দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ফকির তার এক প্রান্ত ডুবিয়ে ধরে তেল-ভরা ঝিনুকের মধ্যে। তারপর বাতির শিখার ওপর দড়ির তেল-মাখান মাথাটা পোড়া দেয়। দড়ির প্রান্ত থেকে যখন ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে, তখন ফকির কুণ্ডলায়িত ধোঁয়াসহ গরম প্রান্তটা কাসুর নাকের মধ্যে বারবার প্রবেশ করিয়ে দেয়।

কাসু যন্ত্রণায় উঃ ক'রে ওঠে প্রত্যেক বার। তার কোমরটা বিছানা ছেড়ে উঁচু হয়ে উঠে। শক্তি নিঃশেষ করে হাঁচি দেয় কয়েকবার।

মুখে হাসি টেনে ফকির বলে—অ্যাচি দিছে, আর চিন্তা নাই।

এই অ্যাচির ঠেলায় আলাই-বালাই পলাইব। যদি একেন্ত না-ই পলায়, তয় মগরিবের ওক্তে একবার খবর দিও। আইজ রাইতেই বৈডক দিমু। হেইখানে বোলাইয়া ওর চৌদ্দগুষ্ঠির শেরাদ্দ করমু। ভালয় ভালয় যদি না যায় ত ওস্তাদ শেখ ফরিদের নাম লইয়া এমুন মন্তর ঝাড়মু যার তেজে সুড় সুড় কইর‍্যা আমার বোতলের মইধ্যে ঢুকব। আমি তহন চট্ কইর‍্যা বোতলের মোখ্ডা বন্ধ কইর‍্যা দিমু। তারপর আমার শিথানের নিচে মাডিতে গত্ত কইর‍্যা বোতলডা উপুড় কইর‍্যা বহাইয়া মাডি দিয়া ঢাইক্যা দিমু। আমার শিথানের নিচে কি একটা-দুইডা! এই রহম কত ভূত-পেত্নী, দানা-পিচাশ, জিন-আতস কবর দিয়া থুইছি, লেখা-জোখা নাই। কিন্তুক জাহিলগুলার মউয়ত নাই। রাইতে যহন বালিশে মাথা রাখি, তহন কত কান্দা-কাডি। কয়—আর কোন দিন আদমজাতের ক্ষেতি করতাম না। একবার ছাইড়্যা দ্যাও। তোমার গোলাম অইয়া থাকমু। তোমারে পাকিস্তান জয় কইর‍্যা দিমু, পাকিস্তানের রাজা বানাইমু। আমিও কই—আমি রাজা অইতে চাই না। তোরা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বোতলের মইধ্যে থাকবি। গোলমাল করলে উফায় নাই।

করিমবক্শ শোনে মনোযোগ দিয়ে। ফকিরের গল্প শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক। একটা কুলোয় করে সে সোয়া সের চাল আর সোয়া পাঁচআনা পয়সা এনে ফকিরের পায়ের কাছে রেখে দেয়।

রাত বারোটার পর বৈঠক। মোমবাতি, আগর বাতি জ্বালিয়ে লোকজন ও সাগরেদ সহ দিদারবক্শ ফকির 'ভাড়ানে' বসে।

আগেই সে জিজ্ঞেস করে—কার উপ্রে চালান দিমু, করিমবক্শ? তোমার উপ্রে?

—বাপ্পসৃরে! ওহোঁ, আমার ডর করে।

—ডর করলে চলব ক্যাঁ? তোমার উপ্‌রে ত আর চিরজনম ভার অইয়া থাকুব না। আমার কাম অইয়া গেলে আবার নামাইয়া দিমু।

—না। আর কেওরে কইয়া গ্যাহেন।

—কে আছে আর? রুস্তম, তুমি? সাদেক? হারুণ? কিছু ডর নাই। এক্কেরে পান্তাভাত।

সবাই মাথা নেড়ে অস্বীকার করে। শেষে ফকির তার এক সাগরেদকে ঠিক করে। তার ওপরেই ভর করবে ভূত।

দিদার বক্‌শ মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়—খবরদার, কেও চউখ উপর দিক্ কইর‍্য না। ভুতের চউখে চউখে পড়লে তোমাগ চউখ গইল্যা পানি অইয়া যাইব।

ফকির এবার বাবরি চুল নাচিয়ে গলার মধ্যে কেমন ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ ক'রে 'জিকির' আরম্ভ করে।

এক সময়ে ঘরের চালার ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে।

ফকির বলে—চাইঙ্গা মারস ক্যাঁ? পিড়্‌পিড়াইয়া ঘরে আয়। ঘরে আইতে অইবই।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের চালাটা কড় কড় করে ওঠে। সাথে সাথে ফকিরের চেলাটিও দুল্‌তে আরম্ভ করে, আর গলার ভেতর অদ্ভুত ফ্যাস্ ফ্যাস শব্দ করে—হ্যাঁরোঁ—হাঁম—হুঁম।

সবাই বুঝ্‌তে পারে, ওর ওপরে ভূত 'ভর' করেছে।

দিদার বক্‌শ এবার টানা সুরে বল্‌তে আরম্ভ করে—

আমার নাম দিদারবক্‌শ শুইন্য মন দিয়া,
আমার নামে ভূত-পেত্নী সবাইর কাঁপে হিয়া।
শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি,
হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নী ভেণ্টাইবার পারি।
হ্যারে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

তোমার লেইগ্যা বইস্যা আছি কও তোমার নাম।
কিবা জাত, কিবা গোত কোন্‌খানেতে ধাম ?
হ্যারে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

সাগরেদের ওপর চালান-দেওয়া ভূত বলে ঃ—

আমার নাম ল্যাজ ফট্‌কা থাকি ডালে ডালে,
কাচ্চা-বাচ্চা পাই যদি ভরি দুই গালে।
সিয়ানা অইলে তার কান্ধে চইড়া বসি,
লহু-মাংস শুষে খাই সারা দেহ চষি'।
হ্যারে—হাঁই—হুঁম—হাঁই—হুঁম-হাঁই।

রুস্তম অন্ধকারের মধ্যে বাম হাত চালিয়ে পাশের সাদেকের পিঠে চাপ দেয়। উদ্দেশ্য সাদেকের মনে এ ব্যাপারে আরো বেশী বিস্ময় জাগিয়ে তোলা। কিন্তু সাদেক কাঁপছে থরথর করে। তার রক্তও বুঝি হিম হয়ে যায়।

পাশের ঘরে কাসু থেকে থেকে প্রলাপ বক্‌ছে।

ফকির আবার বলে—

শোন্‌রে ভাই ল্যাজ ফট্‌কা রাখ্‌ বাজে কথা,
বাঁচ্‌তে চাইলে উড়াল দে যথা ইচ্ছা তথা।
হ্যারে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।
এই বাড়ী ছাইড়্যা যদি না যাস্‌ চলে,
লোয়া পুইড়্যা লাল কইর‍্যা ছেঁকা দিমু গালে।
হ্যারে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

ভূত বলে—

তোর মতন ফকিরের রাখি কিরে ডর ?
কত ফকির ভাইগ্যা গেল খাইয়া থাপ্পড়।
হ্যারে—হাঁই—হুঁম—হাঁই—হুঁম—হাঁই।

বিছানার ওপর দুই হাতের দাপট মেরে ফকির বিকট চীৎকার করে—

তয়রে হারামজাদা বইস্যা থাক্ সোজা,
পাগলা দিদার মন্তর ঝাড়ব বুঝ্‌বি এহন মজা।
কই গেলিরে ল্যাবা ভূত, কই গেলিরে ট্যাবা,
কই গেলি কাইল্যা ঠ্যাড়া কই গেলিরে খ্যাবা.
সমুদ্দূরের ফেনা আইন্যা—

ভূত এবার ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। দুই হাতে ফকিরের পা জড়িয়ে ধ'রে বলে—না, না, না। আমি এহনি চইল্যা যাই। সর্বনাশ কইর‍্য না আমার। বাপ্পুসূরে!

—হ, অহনি চইল্যা যা। দেরেং করলে বোতলের মইধ্যে আটকাইয়া ফালাইমু, কইয়া দিলাম হেই কথা।

—তুমি আমার মনিব। আমি তোমার নফর। যাওনের আগে একটা ভোগ দ্যাও।

—কিয়ের ভোগ?

—আড়াই গণ্ডা শবরীকেলা, মিহিন চাউলের ভাত
সেরেক পাঁচেক মাইপ্যা দিও কাইট্যা কেলার পাত।
ঝাল ছাড়া নুন ছাড়া পোড়া গজার মাছ,
রাইখ্যা দিও এই গুলা যেথায় তেঁতুইল গাছ।

ফকির বলে—আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিমু। তুই অহন পালা।

অন্ধকারের মধ্যে ঘরের চালাটা আবার কড় কড় ক'রে ওঠে।

বাতি জ্বালাতেই দেখা যায় ফকিরের সাগরেদ বিছানার উপর বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। ফকির ও তার অন্যান্য সাগরেদ ছাড়া আর সবারই মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ফকির এবার পানিতে হাত ভিজিয়ে সাগরেদের গায়ের উপর ছিটিয়ে দেয়। সাগরেদ লাফ দিয়ে ওঠে।

ফকির আড়মোড়া ভেঙ্গে সাগরেদকে জিজ্ঞেস করে—কিরে, কই আছিলি এতক্ষুণ ?

—ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।

ফকির মাথা নাড়ে আর গোঁফের তলা দিয়ে হাসে।

করিমবক্‌শ বলে—ঘুমাইছিলা! আর তোমার উপরে এত তফরখানা গেল!

ফকির অভিভাবকের মত বলে—থাউক, থাউক। ওয়া নিয়া আর মাথা ঘামাইয়া কাম নাই। শোন করিমবক্‌শ, কামডা খুব সহজেই অইয়া গেল। ওরে ওই হগল খাইতে দিলেই ও চইল্যা যাইব। কাইল বাজার তন গজার মাছ, কেলা আর চিনিগুড়া চাউল আইন্যা আমার কাছে দিও। তেঁতুইল গাছের গোড়ায় আমিই রাইখ্যা আসমু ঠিক রাইত দুপুরের সুময়। তোমাগ যেই ডর! তোমাগ উপরে এই কাম ছাইড়্যা দিতে ভস্‌সা পাই না।

একটু থেমে আবার সে বলে—ভূত ছাইড়্যা গেলে কাসুর গোসল করাইয়া পাক-সাফ করতে অইব।

—গোসল! এই জরের মইধ্যে!

—হ, হ। জর কুথায় দ্যাখছ তুমি ? এইডাও জাননা ওরা আগুনের তৈয়ারী ? আমাগ মতন মাডির তৈয়ারী না। যেডির উপরে চাইপ্যা থাকলে শরীল গরম না অইয়া যায় ? পরশু বেহানে মোরগের বাকের আগে কাসুরে রাস্তার তে-মাতায় নিয়া গোসল করাইতে অইব। তুমি সাত পুকুরের পানির যোগাড় রাইখ্য। সাত ঘাডের না কিন্তুক। এক পুকুরেরও সাতখান ঘাড থাকতে পারে। সাত পুকুরের পানি অওয়ন চাই।

ষোল

মায়মুন শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে। জয়গুন রাগে ফেটে পড়ে। কঠিন স্বরে জেরা করতে আরম্ভ করে—না কইয়া পলাইয়া আ'লি ক্যাঁ? এখন মান্ইষে হুন্লে ঝাঁটা মারব মোখে।

—পলাইয়া আহি নাই, মা। খেদাইয়া দিছে। হ, ছাহ না আমার নাক-কান খালি। গয়নাগুলা খুইল্যা নিছে। পিন্দনের কাপড়ডা রাইখ্যা এই ছিঁড়া কাপড়ডা দিছে।

মায়মুনের কৈফিয়তে জয়গুনের রাগ নামে। ব্যাপারটার কিছু কিছু সে হাসুর কাছে শুনেছিল সেদিন। কিন্তু তার শ্বাশুড়ীর এরূপ আচরণের কোন কারণ হাসু বলতে পারেনি। সেও ভেবে পায় না। জয়গুন আবার জেরা করে—কি দোষ করছিলি? ক' শিগ্‌গীর। দোষ না করলে এম্বায়ই খেদাইয়া দিছে?

মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ীর কেউ পছন্দ করেনি। সোলেমান খাঁও না। কিন্তু অপছন্দের কথা সে কখনও মুখ ফুটে বল্‌তে পারে নি। কারণ সে নিজেই দেখেশুনে ছেলের জন্য বউ পছন্দ করেছিল।

মায়মুন যেদিন প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসে, সেদিনই তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

শ্বাশুড়ী বলে—তুমি কি চউখের মাথা খাইয়া বউ দেখছিলা? এই রহম জালি বউ দেইখ্যা-হুইন্যা আনে কেও? এহন ভাত-কাপড় দিয়া পাল্‌তে অইব।

—জালি কুথায় দ্যাখছ তুমি? এক্কেরে ঝুনা নাইকল।

—হ, ঝুনা না আরো কিছু। ও না পারব ওস্‌মানের ঘর করতে, না পারব এক কলসী পানি আন্‌তে। দুই ঠ্যাং লইয়া ঢেঁকির উপরে

ওঠ্‌লেও কথা হোন্‌ব না ঢেঁকি। তুইসের চাউলের ভাতের আঁড়ি উডাইতে গেলে ফেলাইয়া দিব। তখন ভাতও যাইব, আঁড়িও যাইব।

সোলেমান খাঁ কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারে। কিন্তু নিজের কৃতকর্মের জন্য স্ত্রীর কাছে সে হার মান্‌তে রাজী নয়। সে স্ত্রীকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বলে—তুমি কিচ্ছু চিন্তা কইর‍্য না। হবায় বিয়ার পানি পাইছে। তুইমাসের মইদ্যেই দ্যাখ্‌বা বউ আমাগ লায়েক অইছে।

কিন্তু দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। মায়মুন তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর চোখের সামনে তাদের ইচ্ছা মত বড়-সড় হয়ে উঠ্‌ল না। যেমন ছিল, তেমনটি রয়ে গেল। শ্বাশুড়ীর রাগ ধরে—কেন সে 'ভোমরায় আল দেওয়া কদুর' মত ঝিম্ ধরে থাকল, কেন হাতে-পায়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল না ?

সোলেমান খাঁর এজলাসে প্রায়ই এ ব্যাপারে শুনানি হতে থাকে।

একদিন সোলেমান খাঁর স্ত্রী বলে—ভাত খাইতে ত কম খায় না। আমাগ তুনা ভাত খায়। যদি জিগাই—আর ভাত নিবি বউ ? তয় কোন দিন 'না' করব না। আঁসের মতন গলা সমান খাইয়া টাব্‌বুস্ অইয়া তারপর উঠ্‌ব। এত খাওয়া ত' বড় অওনের নাম নাই। আর অইবই বা কেম্‌নে! স্যুর্য-দীগ্‌লা বাড়ীর মাইয়া। পরাণ লইয়া বাইচ্যা আছে, এই কফালের ভাগ্য। তোমারে হেইস্নুম কত কইর‍্যা যে কইলাম—স্যুর্য-দীগলা বাড়ীর মাইয়া আননের কাম নাই। হেইয়া হোন্‌লা না। মাইয়ার উপরে পেত্নীর দিষ্টি না আছে ত কি কইলাম।

সোলেমান খাঁ মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর বলে—মানুষ ত তিন আঙুল। এত ভাত রাখে কই ?

—কে জানে কই রাখে ? আমার মনে লয়—গলার তন পাও পর্যন্ত বেবাকখানি ওর পেট। এমুন হাবাইত্যা ঘরের মাইয়া বেশীদিন ভাত-কাপোড় দিয়া রাখলে তোমারে আর বিচ্‌রাইয়া পাওয়া যাইব না। তাল্লুক-মুল্লুক বেচ্‌তে অইব।

সোলেমান খাঁ নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে লয়, তোমার কথাই খাঁডি। পেত্নীর দিষ্টিই আছে। পেত্নী ওর লগে লগে খায় বুইল্যাই না এত ভাত লাগে।

সোলেমান খাঁর স্ত্রী আবার বলে—হোন কই, এই রাক্কস রাখনের কাম নাই। হেদিন ওস্মানের ঘরে দিছিলাম। শরমেরও কথা। রাইতে হেই কি চিক্কইর! আর এট্টু অইলে চৌদ্দ বাড়ীর মানু এক-খানে কইর‍্যা লইত। ছিঃ, ছিঃ! অ-ঘিন্, অ-ঘিন্! বোঝ্‌লাম, এইডা জুয়ান অইতে আমার ওস্মান ধুন্দু অইয়া যাইব। আর এদ্দিন তক্কে বহাইয়া খাওয়াইলে ফউত অইয়া যাইবা, কইয়া রাখলাম। কম-সে-কম তিনখান বচ্ছর ত লাগ্‌ব লায়েক অইতে।

—কি করতে চাও তয়?

—আমি কই, ওরে ওর মার কাছে পাডাইয়া দ্যাও। মারডা খাইয়া বড় অউক। জেরে দ্যাহা যাইব।

সোলেমান খাঁ সব শুনে এবার রায় দেয়—ওরে ওর মা-র কাছেই পাডাইয়া দ্যাও। আবার আমি ওস্মানের শাদী দিমু।

—গয়নাগুলা?

—খুইল্যা রাখ্‌বা। ওসমানের বিয়া দিতে লাগ্‌ব ত। আবার জোড়ায় জোড়ায় গয়না বানাইমু ট্যাকা কই? ট্যাকা কি গাছের গোডা যে ঝুল দিলেই পড়ে? খালি গয়না ক্যাঁ, কাপোড় দুইডাও রাইখ্যা দিবা। কয় মাস আগে কিন্‌ছি। অহনও দুই ধোপ পড়ে নাই। এই কাপোড় আর গয়না দিয়া সাজাইয়া নতুন বউ ঘরে আন্‌মু।

তারপর একদিন হাসু ও শফী আসে মায়মুনকে দেখতে।

মায়মুনের শ্বাশুড়ী, দু'টি ননদ এবং ছোট্ট একটি দেবর একটা চাঙারির চারপাশে চক্রাকারে বসে কাঁচা মটর-শুঁটি ছাড়াচ্ছিল। মানুষ

আসার শব্দ পেয়ে মায়মুনের শ্বাশুড়ী একবার তাকায়। তারপর মাথায় আঁচল টেনে আবার মটরের দানা বাছতে শুরু করে।

হাসু ও শফী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এ রকম অবজ্ঞা ও অবহেলার কি কারণ থাকতে পারে তারা ভেবে পায় না। হাসু জিজ্ঞেস করে—কেমুন আছেন মাঐ সা'ব ? মায়মুন কই ?

উত্তর দেয় মায়মুনের ছোট ননদ—গাঙ্গের ঘাডে পানি আন্‌তে গেছে।

তার মুখের কথা শেষ না হতেই মায়মুন আসে। কাঁখের কলসীটা ছোট। তবুও তার ভারে মায়মুন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। কোমর বেঁকিয়ে খোঁড়ার মত পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে সে আসে। হাসু এবং শফীকে দেখ্‌তে পেয়ে খুশীতে ভরে ওঠে। সে পানির কলসীটা রান্নাঘরে রেখে ছুটে আসে। হাসুর একটা হাত ধরে বলে—মিঞা ভাই গো, কোন্ সুম' আইলা ?

—এইত আইলাম।

—আমি যাইতাম তোমার লগে।

জরিনা বিবি অর্থাৎ মায়মুনের শ্বাশুড়ী এবার ফোঁস করে ওঠে—হ, যাও। ভাইর লগে অহনই চইল্যা যাও। হ হাসেম মিঞা,তোমাগ আহ্লাদি বইন্‌গারে আইজই লইয়া যাও। আমরা আর রাখ্‌তে চাই না।

—কি অইছে মাঐ ? কোন দোষ করছে মায়মুন ?

—না বাপু, অমুন ঝিরকুইট্যা বউ দিয়া আমাগ কাম চল্‌ত না। কই গেলি ওসমান ? কি কইছিলাম ?

জরিনা বিবি ঘরে যায় ওস্‌মানের কাছে। আস্তে আস্তে বলে—গয়নাগুলা খুইল্যা রাখ্। পিন্দনের কাপোড়ডা রাইখ্যা এট্টা ছিঁড়া কাপোড় দিয়া দে। ওডা পিন্দা কোন রহমে শরম বাঁচাইয়া আতে-পায়ে যাউক্‌গা ভাইর লগে।

ওস্‌মানের চোখে-মুখে অক্ষমতা ফুটে ওঠে। হাসু ও শফীর উপস্থিতিতে এ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলে—তুমি দ্যাও গিয়া। আমার শরম করে।

—আহা, আমার নতুন বউ রে! অত যদি শরম তয় ঘোম্‌ডা দিয়া ঘরে বইসা থাক্‌। তোরা মরদ অইছিলি কোন্ হুখ্‌খে? আমি মাইয়া মানুষ। পারি কি না-পারি দ্যাখ্‌ চউখ্‌ মেইল্যা।

জরিনা বিবি গোত্তা দিয়ে দুই পা এগুতেই ওস্‌মান বাধা দেয়—মা, হোন। ওরা আইজ যাউক্‌গা। পরশু তরশু আইয়া যেন লইয়া যায়।

জরিনা বিবি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। ওস্‌মানের দিকে ফিরে বলে—আইচ্ছা, কইয়া দেই।

তারপর ঘর থেকে নিচে নেমে হাসু ও শফীর দিকে চেয়ে বলে—হোন বাপু। কাইল পরশু আইয়া তোমাগ বইনেরে লইয়া যাইও।

হাসু বলে—বিষয় কি? কি অইছে মাঐ?

—কিচ্ছুই অয় নাই, মিঞা। যা কই মনে থাকে যেন।

শফী হাসুর দিকে চেয়ে বলে—আইজই মায়মুনেরে লইয়া যাই।

—না, আইজ থাউক। মা-র কাছে জিগাইয়া যদি নিতে কয় তয় লইয়া যাইমু।

হাসুর কথা শুনতে পেয়ে জরিনা বিবি বলে মা-র কাছে আর হোন্‌তে অইব না, বাপু। তোমার মা মানা করত না। কাইল আইয়া লইয়া যাইও।

—আইচ্ছা।

এই 'আইচ্ছা' বলে যে হাসু চলে গেল আর হাসুর দেখা নেই। জরিনা বিবি নিজেই মায়মুনের গায়ের গয়না খুলে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে তাকে তৈরী করে রেখেছে। তিন দিনের দিনও যখন কেউ এসে নিয়ে গেল না, তখন তার পরের দিন ভোর বেলা জরিনা বিবি নিজে

মায়মুনের হাত ধরে বাড়ীর নিচে মটর খেতের পাশে এনে ছেড়ে দেয়। তাদের পেছনে মায়মুনের দু'টি ননদও এসে দাঁড়ায়।

দূরে সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটা দেখিয়ে জরিনা বিবি বলে—ঐ তালগাছ বরাবইর চইল্যা যাও। খোদায় যদি তোমার কপালে এই বাড়ীর ভাত লেইখ্যা থাকে ত আবার আইও। অহন মা-র বুকের দুধ খাইয়া মোডা-তাজা অও গিয়া।

—আমি একলা যাইমু? মায়মুন জরিনা বিবির মুখের দিকে তাকায়।

—একলা যাইবা না ত দোক্‌লা পাইবা কই? যাও। তোমার রূপ বাইয়া বাইয়া পড়ে না সোনা। পথের মাইন্‌ষে ধইর‍্যা লইয়া যাইব না।

মায়মুন যেন কারাগার থেকে খালাস পেয়ে এল। তার আনন্দই হয়। আর সে আনন্দ বেয়ে যায় প্রত্যেক পদক্ষেপে। পেছনে তাকাতেও তার ভয় হয়।

কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়ে মা-র কর্কশ জেরার মধ্যে পড়ে তার বুক দুরু দুরু করতে থাকে।

জয়গুন আবার জিজ্ঞেস করে—কি দোষ করছিলি?

—কিচ্ছু দোষ করি নাই, মা।

—দোষ-ঘাইট না করলে অম্বায়ই খেদাইয়া দিল? হাসুরে দিয়া অহনই আবার পাঠাইয়া দিমু।

শফীর মা আসে। কথার আগা-গোড়া না শুনেই শুরু করে—পুরুষের ঘরতন পলাইয়া আহে কেও! পুরুষের ঘরই মাইয়া লোকের হাপন ঘর। হেইখানে জিন্দিগী কাডাইতে অইব। হউর-হাউরীর খেজমত করতে অইব। মরলেও হেই মাডি বুকের উপুর লইয়া থাকতে অইব। হেই মাডি ছাড়তে আছে? হেই মাডি কামড় দিয়া পাইড়্যা থাক্‌তে অয়।

মায়মুনের মুখের দিকে চেয়ে দেখে জয়গুন। অসহায় চোখ দুটো টল্‌টল্ করছে, করুণা ভিক্ষা করছে তার কাছে।

এবার মায়মুনের ওপরের সমস্ত রাগ জয়গুন শফীর মা-র ওপর ঢালে। সে বলে—থাউক, থাউক। আর বকর-বকর কইর্‌য্য না। তুমি বুড়া অইছ বাতাসে। তোমার কথায় মাডি খাইছি আমি। অমুন বুইড়্যা জামাইর কাছে মাইয়া না দিয়া কুচি কুচি কইর্‌য্যা কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দেওয়ন ভালা আছিল্। আমার বাড়ীতে থাক্‌তে এমুন আছিল? পেড ভইর্‌য্যা ভাত খাইতে না পাইলেও এই রহম শুক্‌না কাষ্ঠ আছিল্ না।

শফীর মা মায়মুনকে জিজ্ঞেস করে—তোর হাউরী তোরে পেড ভইর্‌য্যা খাইতে দেয় নাই, মায়মুন?

—এই দুই মুঠ ভাত দিয়া কইত—নে, খাইয়া ওঠ বউ। দিন-কাল ভাল না। পেট উনা থাক্‌লে কোন ব্যারাম-আজার অইতে পারে না।

—অ্যাহ্-হ্যা-হ্যা। কাসুর মা বাড়ীত আছ?

গলা খ্যাঁকারী দিয়ে সাদেক মিঞা সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

জয়গুন মাথার কাপড়টা টেনে দেয়। শফীর মা জিজ্ঞেস করে—কি খবর, সাদেক মিঞা?

—খবর বেশী ভাল না। কাসুর খুব অসুখ। যখন-তখন অবস্থা।

জয়গুন চম্‌কে ওঠে। তার পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে। দুনিয়াটা অন্ধকার ঠেকছে চোখে। ঘোম্‌টার নীচে অস্ফুট প্রতিধ্বনি হয়—কাসুর অসুখ! যখন-তখন অবস্থা!

—বে-হাল অবস্থা। করিম ভাই আমারে পাডাইয়া দিছে তোমারে নিতে। দেরী অইলে—

সাদেক মিঞার মুখ দিয়ে কথার শেষটা বের হয় না।

*   *   *

কাসুর শয্যা-পার্শ্বে দু'জন মৌলবী অনর্গল দোয়া-কালাম পড়ে চল্‌ছেন। মাঝে মাঝে করিমবক্‌শের কথার নিচে তাঁদের স্বর চাপা পড়ে যায়। তার আকুল আবেদন কান্নার মত বেরিয়ে আসে—আল্লা, তুমি আমার কাসুরে বাঁচাও। তুমি জান-মালের মালিক। ওর এক জানের বদলে আমি দুইডা জান ছদ্‌কা দিমু। তুমি ওরে বাঁচাও। ওর জানের বদলে দুইডা খাসি ছদ্‌কা দিমু। আল্লা, আল্লা, তুমি রহমান, তুমি রহিম। তুমিই বাঁচানে-ওলা। তুমি—

লম্বা ঘোমটা টেনে জয়গুন দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পিছনে হাসু ও শফীর মা-কে দেখে করিমবক্‌শ বুঝতে পারে, জয়গুন এসেছে। করিমবক্‌শ মৌলবী দু'জনকে ইশারায় সরে যেতে বলে, নিজেও বেরিয়ে যায়।

জয়গুন কাসুর বিছানার পাশে বসে ডাকে—কাসু, কাসু, আমার মণি—

শফীর মা, শফী, হাসু ও মায়মুন বিছানার দুই পাশে বসে। আঞ্জুমনও আসে। তাদের সকলের মাথা ঝুঁকে থাকে কাসুর মুখের উপর।

শফীর মা বলে—চাইয়া ছ্যাখ্, কাসু। তোর মা আইছে।

কাসু কোন সাড়া দেয় না। চোখ দুটো আধ-বোজা। মাথাটা কখনও সোজা হয়, কখনও এ-পাশে ও-পাশে হেলে পড়ে। তার নিশ্চল হাত-পা ছড়িয়ে আছে লম্বা হয়ে। অনিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের ওপরের কাঁথাটা দুলে ওঠে। বুকের ওপর কান পেতে কফের 'ঘ্যাড় ঘ্যাড়' শব্দ শোনা যায়।

জয়গুন আবার ডাকে—কাসু বা'জান, একবার চউখ মেইল্যা ছ্যাখ্।

করিমবক্‌শ ডেকে বলে—কাসু, চাইয়া ছ্যাখ্ তোর মা আইছে।

কাসুর মাথাটা বাম কাত থেকে ডান কাত হয় শুধু। কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

আঞ্জুমন বলে—দুই দিন আগেও টাস্ টাস্ কথা কইছে। দুই দিন ধইর‍্যা জ'ব বন্ধ। কত ফকির-কবিরাজ, কত কত পানি-পড়া, তাবিজ-তুমার। কিছুতেই কিছু অইল না। যে যা কইছে কোন তিরুডি অয় নাই। অহন আল্লার আতে সর্পর্দ। অউয়ত-মউয়ত আল্লার আত। আল্লায় যদি মোখের দিক্ চায়।

করিমবক্শ দোর গোড়া থেকে বলে—আল্লা যদি কাসুরে দুইন্যায় রাইখ্যা যায়, তয় আমি জমিনের উপ্‌রে খাড়ইয়া মানতি করলাম, কাসুর একটা জানের বদলে দুইডা খাসি জবাই কইর‍্যা তার গোশ্‌ত গরীব মিসকিন্‌রে বিলাইয়া দিমু। কাসুরে আজমীর শরীফ খাজা-বাবার দরগায় লইয়া যাইমু।

জয়গুনের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে অবিরল ধারে। হৃদয়-ভেদী কান্নার বেগ চেপে রাখতে গিয়ে তার স্বর ভেঙে যায়। ভাঙা গলায় সে আঞ্জুমনকে বলে—দুইডা দিন আগেও যদি আমারে খবর দিত। ওর মোখের কথা হুইন্যা মনেরে বুঝ্ দিতে পারতাম। ওর 'মা-মা' ডাক হুইন্যা পরাণ শীতল করতাম।

একটু থেমে আবার বলে—তোমরা ডাক্তর দেহাইছিলা?

—ডাক্তর কি করব? কত ফকির হট্ খাইয়া গেল।

—ওহোঁ। তোমরা যাই কও, আমি ডাক্তর দেহাইমু।

অন্ধকারের মধ্যে জয়গুন আলো খুঁজে বেড়ায়। নিরাশার মধ্যেও আশা চেপে ধরে বুকে। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সে হাল ছেড়ে দেয় না।

হাসুকে সে নির্দেশ দেয়—হাসু, যা। জগদীশ ডাক্তর না অয় আর কোন ডাক্তর জলতি কইর‍্যা লইয়া আয়। পথে দেরী করিস্

না। বলেই সে মনে মনে চিন্তা করে, ডাক্তার আস্‌লে টাকা দিতে হবে। কিন্তু কোথায় টাকা ?

জয়গুন এবার শফীকে বলে– তুই বাড়ীত যা। বড় আঁস দুইডা বাজারে লইয়া যা। বেইচ্যা ট্যাকা লইয়া চালাক কইর‍্যা আ'বি। কিন্তুক দুইডা আঁসে কত পাওয়া যাইব! বড় জোর দুই ট্যাকা।

মায়মুন বলে—আমার আঁস দুইডাও লইয়া যাইও, শফী-ভাই। আমাগ কাসু বাঁচলে কত আঁস পাওয়া যাইব আবার।

জয়গুন বলে—হ, চাইড্যা আঁসই লইয়া যা।

শফীর মা শফীকে সাবধান করে দেয়—জল্‌দি কইর‍্যা যা। তোর কিন্তুক আবার শামুকের চল্‌তি। দেরী করলে উফায় রাখতাম না।

* *

নিয়মের দুনিয়ায় অনেক অনিয়ম আছে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' তাই সব সময়ে পাওয়া যায় না।

মাথার ঘাম পায়ে-ফেলা সারাদিনের কর্মফল বড় সামান্য। পরোপকার প্রায়ই বিফলে যায়। সে কর্মে যদিও ফল ফলে, তা তেতো, বিষাক্ত।

এটা অনিয়ম বৈকি।

গ্রামের বুড়ো ডাক্তার রমেশ চক্রবর্তীর বেলাও এ অনিয়মটা নিয়মিতভাবে বিদ্যমান। বিশ বছর রুগী দেখে, ওষুধ ঢেলে-গুলে তিনি হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু এই পর্যন্তই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেও অর্থ সঞ্চয় করেন নি কিছুই। অসহায় রুগীর চিকিৎসার বোঝাই ঘাড়ে নিয়েছেন শুধু। টাকার সিন্দুক তাই বোঝাই হল না কোনদিন।

সাধারণভাবে গ্রামের লোকের আস্থা নেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার

ওপর। তাদের ধারণা—এলোপ্যাথিকের তেজাল ওষুধ পেটে গেলে রুগী যা-ও ত্ব'ঘণ্টা বাঁচত, তা-ও শেষ হয়ে যায় ত্ব'ঘণ্টা আগেই। গ্রামে তাই ফকির-কবরেজদের পসার বেশী। ওষুধ-মেশানো পানির চেয়ে বেশী কদর মন্ত্র-পূত পানির। সোয়া-সের চাল আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে যেখানে ফকির বিদায় করা যায়, সেখানে টাকা খরচ ক'রে ডাক্তার বড় কেউ ডাকে না।

ধরা-বাঁধা কয়েক ঘর লোক আছে রমেশ ডাক্তারের। ঘুরে ফিরে তারাই আসে। ত্ব'টাকা দেয়, মাসখানেক ধ'রে চিকিৎসা করিয়ে নেয়। ওষুধ খেয়ে খেয়ে টাকার দাম তোলে। চিকিৎসায় টাকা খরচ করবার মত বড় লোক যারা, তারা এখানে আসে না। তারা যায় বড় ডাক্তার জগদীশ বাবুর কাছে। দিন-মজুরের কাছ থেকে দিন-মজুরি নিয়ে রমেশ ডাক্তারের দিন চলে টেনেটুনে।

রমেশ ডাক্তারের বাইরের ঘরটা একাধারে ডাক্তারখানা ও বৈঠকখানা ত্বই-ই। ঘরের এক পাশে ত্বটো আলমারী। তার মধ্যে নানা আকারের শিশি-বোতল সাজান। ও-গুলোর অধিকাংশই খালি। সুদিনে যখন ওষুধ পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত, তখনও ও-গুলো পূরোপূরি ভরা ছিল না। আলমারীর একটা তাকে ভারী ভারী কয়েকখানা ডাক্তারী বই। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার এক পাশে ডাক্তারের বস্‌বার জন্যে একখানা কাঠের চেয়ার, অন্য তিন পাশে টিনের চেয়ার তিনখানা। এক পাশে একটা লম্বা টুল। দেয়ালে পিঠ ঠেস্ দিয়ে আরাম করে বস্‌বার জন্য টুলটাকে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে রাখা হয়েছে। অপর পাশে দেয়ালের সাথে ঠেকানো একটা কাঠের চেয়ার। তার পেছনের একটা পায়া ভাঙা। আসন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হুঁসিয়ার করার জন্য পায়া-ভাঙা চেয়ারটায় কে একজন একটা কাগজ এঁটে দিয়েছে। তাতে লেখা—খোঁড়া। এত

হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নিরক্ষর গহু প্রধান একদিন চেয়ারটা নিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তারের চোখের সামনে একটা দেয়াল ঘড়ি। বহু দিন ধ'রে অ-মেরামত পড়ে আছে। কোন রসিক লোক ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে ঘড়িটার কাঁচের উপর একটা কাগজ এঁটে দিয়েছে। কাগজটাতে লেখা—'কলেরা রুগী'।

লেখাটা দেখে রমেশ ডাক্তার হেসে ফেলে বলেছিলেন—কলেরা নয়, কলেরা নয়। হৃদ-বন্ধ। কলেরা হলে এমন ওষুধ খাইয়ে দিতাম—

—কলেরার আবার চিকিস্‌সা আছে নি? ডাক্তারের কথা শেষ না হতেই জাফর মিঞা বলে।

—নেই কেন? নিশ্চয় আছে। জীবনে কত কলেরা রুগী ভাল করলাম এই হাতে।

—তয় হেইডা আসল কলেরা নয়। পেডের অসুখ! আসল কলেরা-বসন্ত অইলে আবার মানুষ বাঁচে?

—বাঁচেনা মানে? একশো বার বাঁচে। এবারও কত রুগী বেঁচে গেল আমার হাতে।

নিত্যানন্দ বলে—তুমি আবার মানুষ বাঁচাতে পার নাকি, ডাক্তার?

—নিশ্চয় পারি।

ডাক্তারের কথায় সবাই হেসে ওঠে। অনেকে মনে করে—ডাক্তারের ক্ষ্যাপামিটা আজ আবার বেড়ে গেল।

—এ কি! তোরা হাসছিস্? মানুষ যদি বাঁচাতে না পারি, তবে তোরা আসিস্ কেন? আমার ওষুধ খাস্ কেন? ডাক্তার টেবিলের ওপর চাপড় মারেন।

কালীপদ বলে—তোমার কাছে আসি মনের শান্তির জন্যে, মনের

বুঝ্ দিতে। তা ছাড়া কি। তুমি বাঁচাতেও পারনা, মারতেও পার না। মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত।

কালীপদ ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে ঈশ্বরের অবস্থান নির্দেশ করে।

মুখ বিকৃত করে রমেশ ডাক্তার বলেন—মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত? তবে দেব এক ফোঁটা পটাসিয়াম সায়নাইড? দেখি কে বাঁচায়।

নিত্যানন্দ বলে—তোমার ঐ বাজে কথা রাখ, ডাক্তার। মাথাটা তোমার আজ আবার গরম হয়েছে, বুঝলাম। জগদীশ সেন এত বড় ডাক্তার, সে-ও এত বড় কথা বল্‌তে সাহস করে না। ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে সে। সেদিন অজিত চৌধ্‌রীর ছেলে মারা গেল। জগদীশ ডাক্তার চৌধ্‌রীকে বল্ল—আমরা ওষুধ দিতে পারি, জীবন ত আর দিতে পারি না।

—ও সব ফাঁকা কথা, বুঝলে? অজ্ঞতা ঢাক্‌বার পথ ওটা। লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার বুলি। আসলে ও কথার কোন অর্থ হয় না। এমন অনেক রুগী আছে, যার বাঁচবার ভরসা ছিল না, আমাদের ওষুধ খেয়ে সে হয়ত বেঁচে ওঠে। ঐ-টুকু ওষুধ না পেলেই হয়ত আর বাঁচত না। আমাদের হাতে এ-রকম বহু লোক বেঁচে যায়। যখন বেঁচে ওঠে, তখন নাম হয় উপরওয়ালার। তাঁর গুণ-কীর্তন হয়। মসজিদে শিরনি দেওয়া হয়। হরিলুট দেওয়া হয় মন্দিরে। আমাদের নামও নেয় না মুখে। জালাল শেখের টাইফয়েড হয়েছিল, জানো তোমরা। দুই মাইল পথ হেঁটে রোজ সকালে-বিকালে হাজিরা দিয়েছি, ওষুধ দিয়েছি। আমার কাছে ক্লোরোমাইসিটিন ছিল না। জগদীশের কাছ থেকে নিজের টাকায় কিনে দিয়েছি। যখন বেঁচে গেল, তখন একদিন দেখাও করলে না এসে। আমাকে দিয়েছিল কত জানো? তিন টাকা। শুনেছি আজমীরের দরগায় জালাল পাঁচ টাকা মানত পাঠিয়েছে।

একটু দম নিয়ে আবার তিনি আরম্ভ করেন—আমাদের হাতে সব লোকই যে বাঁচবে তা ত বলছি না। এর কারণ অনেক। একটা কারণ হচ্ছে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমাদের অজ্ঞতা। আমার হাতে যে রুগী মারা গেল, আর একজন ভাল ডাক্তারের কাছে সে হয়ত মরত না। তা ছাড়া রোগ-নির্ণয়ে, ওষুধ-নির্বাচনে ভুল-ভ্রান্তি, ওষুধের অভাব, যন্ত্রপাতির অভাব—নানা কারণ আছে। এ ছাড়াও আছে রুগীর গাফিলতি। সময় থাকৃতে আসৃবে না। আসবে তখন, যখন টলমল অবস্থা। ঐ অবস্থায় ডাক্তার ডেকে কোন কাজ হয় না। ডুবন্ত নৌকা উদ্ধার করা সোজা ব্যাপার নয়। কথায় বলে—মরণ-কালে লক্ষীবিলাসের বড়ি কোন কাজ দেয় না। মানুষ মরবে, এত সত্য কথা। তবে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে ত। বাতির তেল ফুরালে তেল দিতে হবে। ঝড়ে নিবে না যায় তার জন্যে ঢাকৃনা লাগাতে হবে। বাতিটা যে-দিন ফুটো-ঝাঁজরা হয়ে ভেঙে যাবে সে দিনের কথা আলাদা। অবিশ্যি সমস্ত লোককে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার মত চিকিৎসা এখনও আবিষ্কার হয় নি। তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছে দিন দিন।

সবাই বিরক্ত হয় ডাক্তারের ওপর। তারা মনে করে—আজ মাথাটা একটু বেশীই খারাপ হয়েছে ডাক্তারের।

কালীপদ বলে—রাখ তোমার বক্তিমা। এইবার বিদায় কর।

ডাক্তার বলেন—একটু সবুর কর। ওদের আগে বিদায় করি। ওরা দূরের লোক। এসো দেখি দিল মহম্মদ। কদিন থেকে জ্বর?

—আইজ চাইর দিন।

ডাক্তার নাড়ী দেখেন। বুক পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন—দেখি জিভ। হা করো আঁ—এমন করে।

দিল মহম্মদ মুখ হা করে। তার নিশ্বাসের সাথে এক ঝলক দুর্গন্ধ

এসে ধাক্কা মারে ডাক্তারের নাকে। তিনি মুখটা এক পাশে সরিয়ে বলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় নি ?

একটা কাগজে 'ব্যবস্থা' লিখে ডাক্তার বলেন—কোন ভয় নাই। এ কাগজটা কম্পাউণ্ডারকে দাও। দিনে তিন বার। ঠাণ্ডা লাগিও না। শিশি এনেছো ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা যাও। পরশু এসো আবার। আলাউদ্দিন, তুমি এসো। কি তোমার ?

—পেডটা ফুইল্যা রইছে দুই দিন ধইর‍্যা। একবার খাইলে আর খাইতে ইচ্ছা করে না। ভাত দেখলে বমি আহে। খোয়াবে খাইলে হুন্‌ছি এই রহম অয়।

—অ্যা, কি বল্লি ?

—মা কইছে, খোয়াবে যারা খায় তাগ পেড ভার অইয়া থাকে এই রহম। হজম অয় না।

বুড়ো ন'কড়ি বলে—ডাক্তারের কাছে এ-গুলি কইস্ না। এই সব ভূতের ব্যামোর কিছু ডাক্তারে বুঝব-ও না, বিশ্বেসও করব না। আমিও কত দিন স্বপ্নে খাইছি—নসগোল্লা, সন্দেশ, জিলাফি, কচরী, পানতুয়া,—

ন'কড়ি মিষ্টির নামের শিকল ছাড়তে শুরু করে।

মুচকি হেসে ডাক্তার বলেন—খেতে কেমন লাগে ?

—কেমন লাগব আবার। ভালা। ঠিক হালুইকরের মিষ্টির মতন। কিন্তুক অজম অইতে চায় না। অজম অইলে কি আর কথা আছিল্ !

ডাক্তার রহস্য করে বলেন—সত্যি। হজম হলে আর কোন কথা ছিল না। বাজারে যখন রসগোল্লা-সন্দেশ পাওয়া যায় না আজকাল, তখন স্বপ্নে বিনে পয়সায় —

—বেশ মজা কইর‍্যা খাওয়ন যাইত। ডাক্তারের মুখের কথা লুফে নিয়ে ন'কড়ি বলে।

ডাক্তার এবার গর্জন করে ওঠেন—হুঁঃ. যত সব আহাম্মক নিয়ে কারবার। যা এখান থেকে। স্বপ্নে রসগোল্লা খা গে। ওষুধ খেতে হবে না।

আলাউদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নেন। জামাটা তুলে রাগের সাথে জোরে জোরে তার পেট টিপতে শুরু করেন।

বাঁধা-ধরা একঘেয়ে জীবন ডাক্তারের এমনি করেই চলে। চলে ঘড়ির কাঁটার মতই একই পথে। কিন্তু তাঁর কাছে বৈচিত্রহীন এক-ঘেয়ে বলে মনে হয়নি কোনদিন। মূর্খ লোকের কার্য-কারণহীন আজগুবি কথা-বার্তা শুনে তিনি যত বিরক্ত হন তাদের অজ্ঞতার জন্য, তার চেয়েও বেশী সহানুভূতি জাগে তাঁর মনে। এ সমস্ত লোকের নাড়ী দেখে দেখে তাদের উপর কেমন একটা নাড়ীর টান জন্মে গেছে ডাক্তারের। ভোর বেলা এদের মুখ দেখলে তবেই তাঁর ভালো লাগে। তাজা হয়ে ওঠে দেহ-মন।

কিন্তু কিছুদিন ধরে ডাক্তারের দিনগুলি আর চলতে চায় না। যেন হোঁচট খেয়ে চল্‌ছে দিনগুলি। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়েছে দেশে। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যা-লঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধাঁ। ডাক্তারের স্ত্রীর চোখেও তাই লেগেছে। পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ডাক্তারের পাকা চোখে দূরের সে-আলো নেশা জাগাতে পারে না। পারে না মায়ার সৃষ্টি করতে। স্বামী-স্ত্রীর এই বিরুদ্ধ মনোভাব সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছে। এই একই প্রসঙ্গ নিয়ে কথার প্যাঁচাল শুরু হয় দুজনের মধ্যে। সহজে তা থামতে চায় না। স্ত্রী নানারকম যুক্তি-

তর্কের অবতারণা করেন, বিভিন্ন জায়গার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে স্বামীকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু আদম তার সঙ্কল্পে অটল। সে জানে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অর্থ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হওয়া। ঈভ তাই নিষিদ্ধ ফলের সাঁজি নিয়ে ব্যর্থ হয় বারবার।

আজও ডাক্তার রুগী দেখা শেষ ক'রে সবে আঙিনায় উঠেছেন অমনি গিন্নী আরম্ভ করেন—ওগো শুন্‌ছো, আর তোমাকে বলেই বা কি হবে!

অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গিন্নী বলেন— জগদীশ ডাক্তার আজ যাচ্ছে, শুন্‌ছো ?

—তাতে হয়েছে কি ?

—হবে আবার কি। সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। আর আমরা এখানে জপমালা নিয়ে বসে থাকি আর কি।

—হ্যাঁ, মালা জপ্‌তেই শুরু কর। তাই ভালো। দেখো ঈশ্বর যদি কিছু ব্যবস্থা করেন। চাও ত পুষ্পক রথও পাঠিয়ে দিতে পারেন তোমার জন্যে।

বিরক্তির মধ্যেও নিজের রসিকতায় হেসে ওঠেন ড়াক্তার। তাঁর হাসি গিন্নীর অন্তরে ঘা দেয়। তিনি বলেন—তা তুমি যেয়ো।

—আমি যাব! উহুঁ। এখান থেকে আমি একচুলও নড়ছিনে। এমন সাজানো বাগিচা ছেড়ে নরকে যেতে পারব না।

কথায় সুবিধা করতে না পেরে গিন্নী বলেন– তা বেশ। এখানে থেকে মুসলমানের হাতে যদি কচু-কাটা না হও ত কি বল্লাম।

—ওসব বাজে কথা রাখ। এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি ? কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না, দেখে নিও। ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না—সবাই বুঝতে পেরেছে। ভায়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব তার

পেছনে কাজ করছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা। এ হিংস্রতা শুধু এখানেই নয়। সব জায়গায় উঠতে পারে। যেমন আসামে 'বঙ্গাল খেদা' চাড়া দিয়ে উঠেছে। 'ধূতি-বালা'দের বিরুদ্ধে গুর্খারা কুকৃরি শান দিচ্ছে। বিহারে কোণ-ঠাসা করে রাখা হচ্ছে বাঙালীকে। এখন এক গণ্ডগোলের ভয়ে পালিয়ে আর এক গণ্ডগোলের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। এখানে আমাদের কিসের অভাব? কোন্ দুঃখে যাব আমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে? জানো না, এখানে আমরা মা-র কোলে আছি।

হাসু এসে ডাক্তারের উঠানে দাঁড়ায়।

ডাক্তারের খোঁজে সে এ-গাঁও ও-গাঁও ঘুরেছে। জগদীশ ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। তিনি পাত্‌তাড়ি গুটিয়েছেন। আজই চলে যাচ্ছেন দেশ ছেড়ে। হরেন ডাক্তারও নেই। তিনি অনেক দিন আগেই চলে গেছেন। তাঁর শূন্য ভিটায় গাছ-আগাছা জন্মে তচনচ হয়ে গেছে।

রমেশ ডাক্তার তখনও বকে চলেছেন—এখন হুজুগে মেতে অনেকেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাদের টাকা নাই তারাও যাচ্ছে। অনেকে বাড়ী-ঘর বিক্রি করে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না কিসের নেশায় যাচ্ছে এরা। কিন্তু দেখবে, আবার এরা ফিরে আস্‌বে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ক্ষুধা ও রোগে আধ-মরা হয়ে আবার এরা ফিরবে। কিন্তু তখন আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিল্‌বে না। আমাদের পূর্ব-পুরুষ হিন্দু-মুসলমান আপন-জনের মত কত যুগ যুগ ধরে কাটিয়েছে এ মাটিতে। একের উপর নির্ভর করে বেঁচে উঠেছে আর একজন। একজন যুগিয়েছে ক্ষুধার অন্ন, আর একজন দেখিয়েছে আলো।

ডাক্তার পাশের দিকে চেয়ে দেখেন—গিন্নী নেই। কখন তিনি বেরিয়ে গেছেন। উঠানে হাসু দাঁড়িয়ে। দেখতে পেয়ে ডাক্তার বলেন—কিরে বাপু, কি চাই?

—আমার ভাই-র খুব অসুখ।

স্ত্রীর ওপর এতক্ষণ বক্তৃতা ঝেড়ে রমেশ ডাক্তারের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। তিনি বলেন—আমি যেতে পারব না।

কথাটা বলেই তিনি ভাবেন—আর ত কেউ নেই। হরেন অনেক দিন আগেই চলে গেছে। জগদীশও আজ যাচ্ছে। এ তল্লাটে এ তিন জন ছাড়া আর কে আছে? ডাক্তার যাবার মনস্থ করেন। বাড়ীতে থাকলে আবার স্ত্রীর কথায় কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং রুগী দেখতে যাওয়া ভালো।

জামা গায়ে চড়িয়ে ষ্টেথস্‌কোপ ও 'এমারজেন্সী ব্যাগ' নিয়ে ডাক্তার বের হলেন। পেছন থেকে স্ত্রী বাধা দেন—দুপুর বেলা রোদ মাথায় করে কোথায় চল্লে আবার?

উত্তর না দিয়ে ডাক্তার এগিয়ে যান।

—চান করে খাও-দাও। বিকেলে যেও। স্ত্রী তাগাদা করেন।

স্ত্রীর কথাগুলোকে শ্লেষের আঘাত করে ডাক্তার বলেন—চান করব, আবার খাব! এ দিকে মানুষ মরে যাচ্ছে।

পেছন ফিরে ডাক্তার আবার বলেন—এবার দেখ আমরা চলে গেলে এদের কি উপায় হবে। এতগুলো গ্রামের মধ্যে আমরা তিনটে ডাক্তার ছিলাম। দু'জন ত চলেই গেল। আমিও যদি চলে যাই, তবে এরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

ডাক্তারের ব্যাগটা হাসু হাতে করে নেয়।

ডাক্তার রুগী দেখে চিন্তিত মুখে বলেন—ডবল নিমোনিয়া। এত দিন ছিলে কোথায়?

করিমবক্‌শ বলে—ফকির দেখছিল এতদিন।

—নাকের ওপর ঘা হয়েছে কেমন করে?

—দড়ি-পড়া দিছিল ফকির।

ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে বলেন—ফকির! দড়ি-পড়া! আমি দেশের রাজা হলে ব্যাটাদের ফকর-বাজী দেখিয়ে ছাড়তাম। ফাঁসি দিতাম ব্যাটাদের। এ নরহত্যা!

ডাক্তার আসায় জয়গুন বড় করে মাথায় কাপড় টেনে পেছন ফিরে বসেছিল। তার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পিট্‌ছে অবিশ্রান্ত। সে এবার ঘুরে ডাক্তারের পা ধরে করুণ মিনতি জানায়—ডাক্তার বাবু, আমার কাসুকে বাঁচাইয়া ছান্। আপ্‌নে আমার ধর্মের বাপ।

সতেরো

জয়গুন আহার-নিদ্রা ভুলে দিনের পর দিন ছেলের শয্যা-পার্শ্বে কাটিয়ে দেয়। মায়মুনও থাকে মা-র কাছে। হাসু রোজ জয়গুন ও মায়মুনের খাবার দিয়ে যায়। প্রত্যেক দিন খাবার সময়ে করিমবক্‌শের ইঙ্গিতে আঞ্জুমনও হাত ধরে টানাটানি করে খাওয়ার জন্যে। বলে—ওই রহম পেডে পাথর বাইন্দা থাইক্য না। দুইডা দানাপানি মোখে ছাও, বু। না'লে শরীল তোমার ভাইঙ্গা যাইব।

জয়গুন খেতে যায় না। সে ভাবে, এ বাড়ীর ভাত তার কপাল থেকে অনেক আগেই উঠে গেছে।

সে হাসুর রেখে-যাওয়া ভাত মায়মুনকে দেয়। নিজেও খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার খাওয়া আসে না। দু'এক মুঠো ভাত জোর করে গিলে এক মগ পানি খেয়ে একদিন কাটিয়ে দেয়।

দিনের বেলা যেমন তেমন ক'রে কেটে যায়। কিন্তু রাত্রি বেলা জয়গুনের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে রাত্রির জন্য প্রস্তুত হয়। বাতির তেল না থাকলে মায়মুনকে পাঠিয়ে

পাশের বাড়ী থেকে কুপি মেপে তেল ধার আনে। একটা মালসাতে তুষ সাজিয়ে আগুন দিয়ে রাখে।

রাত্রে জয়গুনের কাছে থাকবার জন্য শফীর মা আসে। সে 'বুড়া মানু', তাই তার ঘুম কম। রাত্রের যে কোন সময় ডাক দিলে তার সাড়া পাওয়া যায়। সে কাছে থাকলে মনে বল পাওয়া যায়। হাসুও দুই রাত্রি ছিল। কিন্তু ও ছেলে মানুষ। সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। সারা রাত্রির জন্য আর সজাগ পাওয়া যায় না। শফীর মা-র জন্য জয়গুন সন্ধ্যার আগেই বেশী করে পান ছেঁচে রাখে, যাতে কাসুর কানের কাছে ঠনর ঠনর করতে না হয়।

শফীর মা অনেকক্ষণ বসে থাকে জয়গুনের পাশে। তারা মুখোমুখি বসে। আগুনের মালসার ওপর হাতগুলোকে গরম করে। মাঝে মাঝে কান, মুখ ও অন্যান্য অঙ্গে গরম হাত বুলিয়ে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। শফীর মা কখনও পান চিবোতে চিবোতে পিচ ফেলে মালসার মধ্যে। তুষের আগুন থেকে ধোঁয়া বের হয়। নানা কথায় সে জয়গুনকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। তার নিরাশ মনে আশা জাগিয়ে তোলে। থানার ঘণ্টা যখন জোড়ায় জোড়ায় বাজে, তখন সে গুনতে আরম্ভ করে সাথে সাথে। বলে—বারো খান বাজল। এইবার এট্টু কাইত অই। আত দিয়া ছ্যাখ কাপড়ডা ভিজ্যা প্যাঁচপেইচ্যা অইয়া গেছে।

শফীর মা কাঁথা উঠিয়ে মায়মুনের পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ে। তার শীতল শরীরের ছোঁয়া লেগে মায়মুন একবার নড়া-চড়া করে ওঠে। শফীর মা বলে—চুপ কইর‍্যা থাক বেডি, অহনি উন্ অইয়্যা যাইব।

শফীর মা গরম হাত দু'টো মায়মুনের গায়ে বুলিয়ে এবার ক্ষতি-পূরণের চেষ্টা করে। জয়গুনকে বলে—আমাগ রক্ত ঠাণ্ডা অইয়া গেছে। খাড়াকৃখাড়ি গরম অয় না। ওগ রক্ত গরম। আমার শফীরে বুকে

লইয়া হুইলে এক মুহূর্তকের মইধ্যে শরীর উম অয়। তা না অইলে পৌষ মাইস্যা শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে জান কবচ অওনের জোগাড়। মাইন্‌ষে কইতেই কয়—

পৌষের হিমে ভীম দমন
মাঘের শীতে বাঘের মরণ

শফীর মা শুয়ে শুয়ে গল্প আরম্ভ করে—ভীম একদিন তার মা-রে জিগায়—'মা, আমার মতন বড় জুয়ান কে? তার মা কয়—'আছে একজন। গাঙ্গের পার দিয়া আঁটলেই তার ছ্যাহা পাইবা।' তহন পৌষ-মাইস্যা রাইত। ভীম কতক্ষুণ পর শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বাড়ীত আহে। মায় জিগায়—'ছ্যাহা পালি, বা'জান?' ভীম কয়—'হগো মা।'

জয়গুন কাঠি দিয়ে তুষের আগুন ঘেটে তাতিয়ে নেয়। আগুনে হাত-পাগুলোকে গরম করে।

ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হিম-শীতল বাতাস ঢোকে। জয়গুনের শরীরের রক্তও জমে ওঠে যেন!

বাতাসে নিভু নিভু করে কুপিটা। জয়গুন উঠে সল্‌তে উস্কিয়ে দেয়। এক প্রস্থ কাঁথা এনে আগুনে গরম ক'রে কাসুর গায়ের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে কাঁথাগুলো পাল্‌টিয়ে দেয়।

করিমবক্‌শ এক সময়ে ডাকে—কাসু কি ঘুমাইছে?

বার দুই ডেকে করিমবক্‌শ ক্ষান্ত হয়। শফীর মা ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়গুন ডান হাত বাড়িয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। শফীর মা ধড়পড় করে ওঠে। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়ে—আল্লা-রছুল। কি কাসুর মা? সারাডা রাইত এম্বায় বইসা" থাকবি? তুই আয় আমার বালিশে মাথা রাইখ্যা এট্টু কাইত অইয়া থাক। ও এহন চুপ মাইর‍্যা আছে।

করিমবক্‌শ আবার ডাকে—ও কি ঘুমাইছে?

—হ ভাই, এখন মেই আছে।

নিঝুম রাত। কোন দিকে সাড়া-শব্দ নেই। অনেকক্ষণ পরে পরে পাখীর কলবল্ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। তারপর আবার নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরে-শোয়া করিমবক্শের নিশ্বাস পতন পর্যন্ত গণনা করা যায়। কানের কাছে কাসুর বুকে কফের ঘ্যাড়ঘ্যাড় শব্দ এবং তার অনিয়মিত হ্রস্ব-দীর্ঘ নিশ্বাস-প্রশ্বাস জয়গুনের আশঙ্কাঘন মনে উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। জমকালো অন্ধকার যেন চারদিক থেকে গিলে ধরবার জন্যে হা করে আছে।

শেষ রাত্রে ভয়ঙ্কর শীত নেমে আসে। জয়গুন আর একবার কাঁথা-বালিশ গরম ক'রে কাসুর বিছানা বদলে দেয়। নিজের হাত-পা-শরীর তুষের আগুনের তাপে গরম করে। তারপর কাসুর কাঁথার নিচে শুয়ে তাকে নিজের বুকের তাপ দিয়ে গরম করবার চেষ্টা করে।

সপ্তাহ খানেক পরে একদিন ডাক্তার বলেন—আর চিন্তা করো না, মা। ভয় কেটে গেছে। তোমার ছেলে এবার ভালো হয়ে উঠবে।

জয়গুনের মুখের ওপর থেকে নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যায়। আশার আলোয় মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। ডাক্তারের ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুক। কিন্তু তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা তার জানা নেই। সে বলে—বাবা, তুমিই আমার কাসুরে বাঁচাইলা। মরণ ঘর তন তুমিই ওরে ফিরাইয়া আনছ।

ডাক্তার আশ্চর্য হন। তার সমস্ত জীবনে এরূপ সহজ-সোজা কথা কোন নিরক্ষরের মুখে কখনও শোনেন নি। ডাক্তার মানুষ বাঁচাতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করে না কেউ।

ডাক্তার বলেন—আমার চিকিৎসা ছাড়াও তোমার শুশ্রূষা অনেক সাহায্য করেছে। তুমি কাছে না থাকলে, সময় মত ওষুধ-পথ্য না দিলে এ রুগী বাঁচান এত সহজ ছিল না।

কাসু ভালো হয়ে ওঠার সাথে সাথে জয়গুনের কর্তব্যও যেন ফুরিয়ে

যায়। একদিন ভোর রাত্রে কাসুকে ঘুমে রেখে সে মায়মুনকে নিয়ে হাসুর সাথে বাড়ী চলে আসে।

জয়গুনের এমনি ক'রে চলে আসার কারণও ঘটেছিল।

শফীর মা সেদিন আসেনি। জ্বর হয়েছিল তার। রাত্রে মা-র কাছে থাক্‌বার জন্য হাসু এসেছিল।

গভীর রাত্রি। হাসু ও মায়মুন ঘুমে অচেতন। কাসুও কতক্ষণ ছটফট ক'রে কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার শিয়রে আগুনের মাল্‌সার ওপর হাত রেখে জয়গুন ঝিমোচ্ছে।

করিমবক্‌শ অন্ধকারে বালিশ থেকে মাথা উঁচিয়ে ঘর ও বারান্দার মাঝের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকায়। কয়েকদিন ধ'রে তাকিয়ে তাকিয়ে তার কেমন নেশা ধরে গেছে। কুপির অস্পষ্ট আলোকে জয়গুনের মুখখানা বড়ই সুন্দর লাগে তার চোখে। চোখ দুটো ঘুমে ঢুলু ঢুলু। কখনও বুজে আসে। সারা মুখে বেদনার ছাপ যেন সুন্দরতর করেছে তার মুখখানা।

করিমবক্‌শ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বারান্দায় নেমে আসে। আওয়াজ পেয়ে জয়গুন গা ঝাড়া দিয়ে বসে। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় লম্বা করে টেনে দেয়।

করিমবক্‌শ এসে কাসুর মাথায় হাত দিয়ে শরীরের তাপ দেখে। জয়গুন বুঝতে পারে, কথা বলার ভূমিকা ছাড়া এ আর কিছু নয়। সে একটু দূরে সরে বসে হাসু ও মায়মুন যেখানে শুয়ে আছে।

করিমবক্‌শ বলে—আমারে দেইখ্যা তুমি ঘুম্‌ডা দ্যাও ক্যা ?

বার তিনেক হল এই একই অভিযোগ।

জয়গুন উত্তর দেয় না।

—আমারে আবার সরম কিয়ের ? এত বচ্ছর আমার ঘর করলা,

আর এহন আমারেই শরম! মাথার কাপড় উডাও, লক্ষ্মী। কথা হোন আমার।

জয়গুনের বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করে।

করিমবক্শ বলে—আমার কথা যদি রাখ তয় একটা পরস্তাব করতে চাই।

জয়গুন নিরুত্তর।

—আইচ্ছা, আমি যদি আবার—

জয়গুন শক্ত একটা কিছু বলবার জন্য মনে মনে মুসাবিদা করে। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুই বের হয় না।

—তোমারে আবার আমি-ঘরে আনতে চাই।

কম্পিত কণ্ঠে জয়গুন বলে—না।

—ক্যা? আমি শরা-শরিয়ত মতই করতাম।

—শরিয়ত মত আগে একজনের লগে সাঙ্গা বইসা হেইখান তন তালাক লইয়া তারপর? ওহোঁ।

—ওয়াতে দোষ কি? লক্ষ্মী, তুমি রাজী অও। তখন কি আন্মুকি করছি ঘরের লক্ষ্মী ছাইড়্যা দিয়া। শরিয়তে আইন আছে এই রহম নিকার।

—শরিয়তে থাকলেও আমি পারতাম না।

—ক্যা? সতীনের ঘর বুইল্যা? তুমি যদি একবার মুখ ফুইট্যা কও 'সতীনের ঘর করতাম না' তয় ফুলির মা-রে রাইত পোয়াইলেই খেদাইয়া দিতে পারি। তুমি একবার এট্টু—

—ওহোঁ।

—ক্যা? ঘরের লক্ষ্মী তুমি। করিমবক্শ জয়গুনের একটা হাত ধ'রে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। জয়গুন ঝাড়া দিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নেয়। পাশের হাসুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়—হাসু, হাসু, ওঠ।

করিমবক্শ চোরের মত উঠে যায়।

বাকী রাতটা জয়গুন বসে কাটিয়ে দেয়। প্রথম মোরগের ডাকের সময় সে হাসু ও মায়মুনকে ডেকে তোলে। কাসু ঘুমিয়ে আছে। তার রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে জয়গুন চোখের পানি রাখতে পারে না। কাসুর গালে একটা চুমো দিয়ে তার গালের সাথে নিজের গাল ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ।

আঞ্জুমনকে ডেকে জয়গুন কাসুর কাছে রেখে যায়। আঞ্জুমন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—আইজ যাইবা ক্যা?

—যাইমু না কি করমু আর? এখন ও ভাল অইয়া উডব। তুমি এট্টু নজর রাইখ্য, বইন। তোমার ত পোলা নাই। মনে কইর্য এইডা তোমারই পেডের।

জয়গুন বাড়ী এসে প্রথমেই শফীর মা-র বিছানার পাশে গিয়ে বসে।

শফীর মা বলে—চইল্যা আলি ক্যা? তোরে দ্যাখ্তে না পাইলে যদি ও চিল্লায়?

—চিল্লাইলে কি করতাম, বইন? যার পোলা হে-ই রাখব। আমার কি! সখেদে বলে জয়গুন।

—আমার ত মনে অয় না করিমবক্শ ওরে রাখতে পারব। ঘুম তন উইঠ্যাই যখন তোরে দ্যাখ্‌ব না, তখন করিমবক্শের দিল-কইলজাডা খুইল্যা খাইয়া ফালাইব না?

—তার আমি কি করতাম। হেদিন কইছিলাম—ওরে আমার কাছে আইন্যা কিছু দিন রাখি। তারপর ভাল অইয়া গেলে যার পোলা হে-ই লইয়া যাইত। ব্যারাম তন ওঠলে এট্টু আবদার করব। হেইয়া সইজ্য অইলে তয় ত। কিন্তুক তুমি মত করলা না।

—কেমুন কইর্যা করি? আমাগ সূর্যু-দীগল বাড়ী। এই খানে মানুষ উজাইতে পারে না। আবার এক বচ্ছর ধইর্যা পাহাড়া নাই।

এমুন সোনার চান মানিক্‌রে এই খানে আন্‌লে যদি একটু উন্নিশ-বিশ অয় তয় বদনাম অইব তোর।

—ক্যা ? আমরা ত কতদিন ধইর‌্যা আছি। আমাগ কি অইছে ?

—আমাগ কথা আলেদা। আমাগ সইয়া আইছে। আর এত দিন বাড়ীর পাহাড়া আছিল্‌। পাহাড়া যেদিন তন নাই হেদিন তন আমার জ্বর যেন্‌ ঘন ঘন ওঠ্‌তে আছে। আবার মায়মুনেরও পরের বাড়ীর ভাত ওঠ্‌ল। এইগুলা কি কম চোট্‌ ?

সূর্য-দীঘল বাড়ীর অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে জয়গুন সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। তবুও তার মন মানে না। তার অন্তর কেঁদে ওঠে। রোগ-শীর্ণ কাসুর কান্না শুন্‌তে পায় সে তার অন্তরে। স্পষ্ট দেখ্‌তে পায়, ঘুম থেকে জেগে কাসু মা-মা বলে কাঁদছে।

অসুখ ভাল হয়ে আসার পর প্রথম চোখ মেলেই সে মা-কে চিনতে পেরেছিল। তারপর যতক্ষণ সে জেগে থাকৃত, কখনও জয়গুনের বুকে মাথা রেখে, কখনও তার হাত আঁকড়ে ধরে থাকত। তার বিছানা ছেড়ে জয়গুনের কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। সে কোথাও গেলে কাসু কান্না জুড়ে দিত। দুর্বল হাত-পা দিয়ে-কাঁথা বালিশ ছুঁড়তে আরম্ভ করত। আজও জয়গুন তার মনের চোখে দেখতে পায়—কাসু পায়ের লাথি মেরে গায়ের কাঁথা ফেলে দিচ্ছে। করিমবক্‌শ বা আঞ্জুমন কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না।

আসলেও তাই ঘটেছিল। করিমবক্‌শ নানারকম লোভ দেখিয়েও কাসুর কান্না থামাতে পারেনি।

রমেশ ডাক্তার জয়গুনকে আনবার জন্য লোক পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি করিমবক্‌শের কাছে জান্‌তে পারেন জয়গুন আর আস্‌বে না।

ডাক্তার তাঁর সুন্দর থার্মোমিটারটা কাসুর হাতে দিয়ে তাকে

সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কাসু সেটা মাটির ওপর ছুঁড়ে ভেঙে দেয়।

ডাক্তার করিমবক্শকে ভর্ৎসনা করেন—শিগ্গীর ওকে ওর মা-র কাছে পাঠিয়ে দাও। এ ভাবে ওকে রাখতে পারবে না। এখনও শরীর দুর্বল। এক্ষুনি নিয়ে যাও। দেরী করো না। আমি ওখানে গিয়ে দেখে আসব। ঐ তালগেছো বাড়ীটা ত? হ্যাঁ, চিনেছি। ওর মা-র কাছে ভাল থাকবে।

করিমবক্শ কাচু-মাচু করে। কিন্তু ডাক্তারের আদেশ লঙ্ঘন করবার সাহস তার হয় না।

সে যখন কাসুকে কোলে করে নিয়ে যায়, তখন রোদের তেজ বেড়েছে। মাঠের আধ-পাকা মশুর-কলাই ও সর্ষের গাছে শিশির-কণা তখনও ঝলমল করছে।

করিমবক্শ কাসুকে এনে জয়গুনের ঘরের দরজার ওপর ছেড়ে দেয়। হাসু ও মায়মুন এসে কাসুর হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। জয়গুন বসে আছে নিশ্চল। চোখের পানি শুকিয়ে তার দুই গালে দুটি রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে। জয়গুন কাসুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় না, বলেও না কিছু মুখে। কাসু দু'হাত দিয়ে তাকে ধরতেই জয়গুন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। হাসু ও মায়মুন পাশে বসে কাসুর পিঠে ও মাথায় হাত বুলায়।

উঠানে করিমবক্শ দাঁড়িয়ে আছে। হাসু মায়মুনকে উঠানে একখানা পিঁড়ে দিয়ে আসতে বলে।

মায়মুন সসঙ্কোচে পিঁড়ে হাতে বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

করিমবক্শের মমতাহীন লাল চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। হাত বাড়িয়ে সে মায়মুনকে ধরতে যায়। কিন্তু তার হাত কাঁপছে কেন? মেহেরুনকে হত্যা করবার সময় যে হাত কাঁপেনি, মায়মুনসহ জয়গুনকে

মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার সময়ও যে হাত তার বিচলিত হয় নি, আজ সেই হাত কাঁপছে কেন? সেই হাতের শক্তি কোথায়? নিজের মেয়েকে স্পর্শ করার শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মায়মুনকে স্পর্শ করবার অধিকারও যেন হারিয়েছে সে।

করিমবক্শের হাতটা আপনার থেকেই নেমে আসে। মাথা নিচু করে সে বাড়ীর দিকে পথ নেয়।

শফীর মা জ্বরের শরীর নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে। বলে—আহা, শুকাইয়া এক্কেরে কাষ্ঠ অইছে মানিক। খালি আঁড়গুলা আছে।

—আঁড় বাইচ্যা থাকলে মাংস একদিন অইবই। কাসুর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জয়গুন বলে।

—হ, আল্লায় বাঁচাইয়া রাখুক। আমার যতগাছ চুল আছে তত বচ্ছর আয়ু যেন্ খোদায় দ্যায়।

* * *

করিমবক্শ এখন রোজ আসে কাসুকে দেখতে। কোনদিন মাঠের মাঝ দিয়ে তাকে আসতে দেখে কাসু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঝোপের আড়ালে বসে থাকে যতক্ষণ না করিমবক্শ চ'লে যায়। তার ভয়, করিমবক্শ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আসে। তার এ বিশ্বাসে ইন্ধন জোগায় মায়মুন। রোজ ভোরে সে পথের দিকে চেয়ে থাকে। করিমবক্শকে দেখতে পেলেই সে হুঁশিয়ারি সঙ্কেত করে। করিমবক্শ ব্যর্থ হয়ে শফীর মা-র ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলে। তার ছেঁচা পানে ভাগ বসায়।

—কি করলা, ভাজ? পরস্তাবডা করছিলা? করিমবক্শ জিজ্ঞাস করে।

—করছিলাম। কিন্তুক রাজী অয়না। বহুত দিন ধই আমিও চেষ্টা করতে আছি। ঢক চেহারায় ত কম না। মাইনষে ছাখলে এহনও এক নজর চাইয়া ছাহে। ষাইডের বান্দে-ছান্দেও ঠিক আছে। এখনও নিকা দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা-কাচ্চা অয়। আমি এত কইর‍্যা বুঝাই, আমার কথা কানেই নেয় না। গছু পরধান কত ঘুরাঘুরি। দুই কানি জমিন আর একখান ঘর লেইখ্যা দিতে চাইছিল।

—আমি ভালার লেইগ্যা কইছিলাম। আমারও সংসার চল্‌ত, আর আমার পোলা মাইয়া লইয়া সুখেও থাকৃত। আমার তিন কানি জমিনও ওর নামে দলিল রেজেষ্টি কইর‍্যা লেইখ্যা দিতাম। তুমি আর একবার কইয়া ছাইখ্য না। যদি সতীনের ঘর করতে রাজী না অয় তয় আঞ্জুমনরেও তালাক দিয়া দিতে পারি। এর বেশী আর কি চায় ?

—কিন্তুক ও যে কিচ্ছুই চায় না। আমার মোখের উপরে কইয়া দিছে, 'যে থু একবার মাডিতে ফালাইছি তা মোখ্‌ দিয়া চাট্‌তে পারতাম না।'

করিমবকৃশ এবার ফতুয়ার পকেট থেকে একটা পান বের ক'রে শফীর মা-র হাতে দিয়ে বলে—খবরদার কেও যেন্‌ না জানে। তোমার ঘরে ডাক দিয়া এই পানডা খাওয়াইয়া দিও। নাগর বাইন্তার আতে পায়ে ধইর‍্যা এইডা যোগাড় করছি। বান্দরের নউখের কলম আর মানিকজোড়ের রক্ত দিয়া এই পানের ওপরে লেইখ্যা দিছে, আর কইয়া দিছে, 'সাত রোজের মইদ্যে যদি ও তোমার লেইগ্যা পাগল না অয় ত আমার নামে কুত্তারে ভাত দিও।'

আঠারো

—কারা ওইখানে ? কে কে ? শফীর মা চেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।—খবরদার, ফলগাছে কোপ দিলে আজগাই ঠাডা পড়ব মাথায়, কইয়া রাখলাম।

কে একজন বলে—আমরা কিন্‌ছি এই গাছ। জিগাও গিয়া হাস্থর মা-রে।

শফীর মা রাগে গরগর করতে করতে আসে—অ্যা হাস্থর মা, টিয়া ঠুইট্যা আম গাছটাও বেচ ছস ?

—হ, গফুর শেখ নিছে ওডা দশ ট্যাহায় লাকড়ির লেইগ্যা।

—ওহুঁ, যেই নেউক ওই গাছ আমি কাট্‌তে দিতাম না।

—ক্যা ? ওই গাছ ত আমার ভাগের।

—ওই গাছ তোর তা মুল্লুকের মাইনষে জানে। কী সোন্দর আম অইছে গাছটায়। জষ্টি মাসে পাকব। তুই এই গাছ বেচলি কোন্ আক্কেলে ? বাচ্চা-কাচ্চারা কি মোখে দিব ? একসঙ্গে অনেকগুলি কথা চেঁচিয়ে শফীর মা হাঁপিয়ে ওঠে।

—কি মোখে দিব আবার ? আগে ভাত খাইয়া বাঁচলে তারপর আম-জাম।

শফীর মা ভেঙচিয়ে ওঠে—তারপর আম-জাম! আমের দিনে বেবাকে আম খাইব, আর ওরা মাইনষের মোখের দিক্ চাইয়া থাক্‌ব। কর যা তোর মনে লয়। তুই গলায় দড়ি দিলেও আর আমি না করতাম না।

—দুইদিন বাদে গলায় দড়িই দিতে অইব। কি করতাম আর। তামরাই হে-সুম ধইর‍্যা বাইন্দা তোবা করাইলা। ঠ্যাং ভাইঙ্গা কত

দিন ধইর‍্যা বইস্যা আছি। একটা না, দুইডা না, চাইরখান পেডের ভাত আছে কই তন ?

শফীর মা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। বাড়ীর দক্ষিণ পাশ থেকে গাছ কাটার শব্দ আসে। জয়গুনের বুকের ভেতরও যেন কুঠারের আঘাত পড়ছে বারবার।

টিয়াঠুঁটে আম গাছটায় আম ধরেছিল এবার খুব। আমও জাতের আম। দুধে মেশালে দুধ নষ্ট হয় না, এত মিষ্টি। আমের তলার দিকটা টিয়ার ঠোঁটের মত বাঁকা। আর পাকলে ঐ ঠোঁটটাই শুধু লাল হয়।

হাসু ও মায়মুন গাছে বোল দেখে কত খুশী হয়েছিল। আর একটা মাস রয়ে সয়ে বেচলে ওরা খেতে পারত। কিন্তু এদিকে পেট ত আর ক্ষুধার জ্বালায় 'র' মানবে না।

করিমবক্শ দুধের হাঁড়ি মাথায় উঠানে এসে ডাকে—কাসু !

কাসু ততক্ষণে পিছ্-দুয়ার দিয়ে পালিয়েছে।

আরো দু-তিন ডাক দিয়েও যখন কাসুর সাড়া পাওয়া যায় না, তখন সে মায়মুনকে ডাকে—একটা ঘডি লইয়া আয়, মায়মুন।

জয়গুনের একবার ইচ্ছে হয় বলে—আমরা দুধ খাই না। লইয়া যান দুধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় না।

মায়মুন ঘটি নিয়ে আসে

করিমবক্শ একসের দুধ ঘটিতে ঢেলে দিয়ে বলে—রোজ এমুন সুম আমি দুধ দিয়া যাইমু। আমাগ ধলা গাইডা বিয়াইছে। কাসুর ভাগ্যে একটা দামড়ি বাছুর অইছে। বাছুরডা ঘাস ধরলে কাসুরে দিয়া যাইমু। কাসু কই গেছে রে ?

মায়মুন উত্তর দেয়—পলাইছে।

করিমবক্শ আর দাঁড়ায় না। যেতে যেতে একবার পেছনে তাকায়। জয়গুনের চোখে চোখ পড়তে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

জয়গুন ধমক দেয় মায়মুনকে—দুধ রাখলি, খাইব কে ?

—ক্যা ? আমরা।

—হ, তোরা-ই খা। আমি ছুঁইতাম না ওই দুধ।

সকলকে চম্‌কে দিয়ে টিয়া-ঠুঁটে আম গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। দু'-একটা পাখীর আর্ত চীৎকার ভেসে আসে পাশের ঝোপ থেকে।

*   *

নাবিক সিন্দবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরশো পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরশো পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি। ঘাড় বদল করেই চল্‌ছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরশ পঞ্চান্নে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামান যায় না।

দেশে চালের দর কুড়ি টাকার নিচে নামে না বছরের কোন সময়েই। ফাল্গুন মাস থেকে সে দর আরো চড়ে যায়। চড়ে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকে। আউশ ধান ওঠার আগে এ দর আর নামে না। ফলে যারা টেনেটুনে দু'বেলা খেত, তারা এক বেলার চালে দু'বেলা চালায়। ফেনটাও বাদ দেয় না। ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দুধ-ভাতের মত করে খায়। যারা দু'বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকৃত, এসময়ে তারাও শাক-পাতার সাথে অল্প চাল দিয়ে জাউ রেঁধে খায়। ক্ষুধিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পেটের জালায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে

পড়ে অনেকে। আশা—দশ দুয়ারে মেগে এক দুয়ারে বসে খাবে। কিন্তু দেশের দশা শোচনীয়। সমস্ত দেশ দিশেহারা। দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে?

এ পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধু কি ভাতের? কাপড়েরও। শত কপাল কুট্‌লেও সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়ে একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। অনেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় একই কাপড়ে। তালি খেয়ে খেয়ে ময়লা জমে জমে ভারী হয়ে ওঠে সে কাপড়। বৃষ্টি ও ঘামে ভিজে বিদ্‌ঘুটে বোট্‌কা গন্ধ ছড়ায়।

জয়গুন অনেক ভেবেছে ভাত-কাপড়ের ভাবনা। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে এ ভাবনার কোন অর্থ নেই, সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। মায়মুনের বিয়ের সময়, ছয়মাস আগে তওবা করে সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আজ পর্যন্ত সেই তওবার অমর্যাদা সে করেনি।

—কিন্তু এমনি করেই কি আর দিন চলবে? এমনি করেই কি পেটের জ্বালা জুড়াবে? কাপড় জুট্‌বে পরনের? জয়গুন প্রশ্ন করে নিজেকে।

পেটের জ্বালা এদিকে বেড়েই চল্‌ছে দিন দিন। দুই দিন একরকম কিছুই খাওয়া হয়নি।

কাল রাত্রে খাওয়ার সময় কাসু জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি খাইবা না, মা?

—আমি রোজা আছি। তোরা খাইয়া ওঠ্। তোর ব্যারামের সুময় মানতি করছিলাম তিনডা রোজা রাখতাম বুইল্যা।

—রাইতেও খাইবা না তুমি? মায়মুন বলে।

—এই রোজায় দিন-রাইত না খাইয়া থাক্‌তে অয়।

কাসু বিশ্বাস করলেও হাসু ও মায়মুন বিশ্বাস করে নি সে কথা। নিজের পাতের কয়েক মুঠো ভাত হাঁড়িতে তুলে রেখে হাসু উঠে গিয়ে বলেছিল—আইজ ভুখ নাই, মা।

হাসুর দেখাদেখি মায়মুনও থালায় ভাত রেখে বলে—আমারও ভুখ্ নাই।

দুইদিনের মধ্যে সেই ভাত কয়টাই পেটে দিয়ে আছে জয়গুন।

বাড়ীর আমগাছ, তেতুলগাছ, ঝাড়ের বাঁশ কেটে 'ছাপ্পন ছাড়া' করে দেয়া হয়েছে। চারটে 'আণ্ডালু' হাঁস বিক্রী করে দিয়েছে। বিক্রী করবার মত আর কিছুই নেই।

বিকেল হলেই কাসু খেলা ছেড়ে মা-র আঁচল ধ'রে তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে, তাগিদ দেয়—ভাত রান্বা না, মা? আমার ভুখ্ লাগছে। এই ছ্যাহ না পেটটা কেমুন ছোড অইয়া গেছে।

কাসু হাত দিয়ে পেটটা দেখায়। জয়গুন দেখে সত্যি পেটটা নেমেই গেছে। সে ফাঁকি দিয়ে বলে—তোর মিঞাভাই মাছ আনলে তারপর পাক করমু। নিত্যি নিত্যি শাক-পাতা ভাল্ লাগে না।

—কি মাছ, মা? ইল্‌শা মাছ?

—হ, ইল্‌শা মাছ।

কাসু খুশী হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাসু এখনও এলো না। জয়গুন কাসুকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য মায়মুনকে বলে— মায়মুন, ওরে লইয়া যা। ঝিঁ-ঝি ধইর‍্যা দে গিয়া। ঐ ছ্যাখ্, হোন্ কেমুন ডাকে।

দুটো নারকেলের মালা জোগাড় ক'রে কাসুকে নিয়ে মায়মুন শফীদের ঘরের ছেচতলায় যায়। দু'হাতে মালা দুটো নিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে—ঠরর্-ঠরর্।

এ রকম শব্দে ঝিঁঝি পোকা আকৃষ্ট হয়। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শব্দকে কেন্দ্র করে উড়তে থাকে। যখন হাতের কাছের কোন কিছুর ওপর বসে, তখন ধরতে বেগ পেতে হয় না।

নিজের অসামর্থের জন্য অবুঝ ছেলের কাছেও লজ্জিত হয় জয়গুন।

পেটের ছেলে, তবুও নিজেদের দৈন্য ঢেকে রাখ্‌বার চেষ্টা করে সব সময়। হাসু ও মায়মুনকে কম করে খেতে দিলেও কাসুকে খেতে দিতে হয় পূরো। যেন সে অভাবের কথা জান্‌তে না পারে।

কাসু হাঁড়ির খবর জানে না। জান্‌বার বয়সও তার নয়। তা ছাড়া জান্‌বার মত কোন কারণও জয়গুন ঘট্‌তে দেয়নি আজ পর্যন্ত।

জয়গুন শুন্‌তে পায়, নারকেলের মালা বাজিয়ে মায়মুন ও কাসু ঝিঁঝি ধরার ছড়া গাইতে শুরু করেছে ঃ

ঝিঁঝি-লো, মাছি-লো,
বাঁশতলা তোর বাড়ী,
সোনার টুপী মাথায় দিয়া
রূপার ঝুমুর পায়ে দিয়া
আয়লো তাড়াতাড়ি।
ঝিঁঝি ঝিঁঝি করে মায়,
ঝিঁঝি গেছে সারের নায়,
সাতটা কাউয়ায় দাঁড় বায়,
ঝিঁঝিলো তুই বাড়ী আয়।
ঝিঁঝির বাপ মরছে,
কুলা দিয়া ঢাক্‌ছে,
ঝিঁঝির মা কানছে,
আয়লো ঝিঁঝি বাড়ীত্‌ আয়।

কিন্তু এ রকম ফাঁকি দিয়ে আর কতদিন? কাল রাত পোহালেই যখন এক মুঠো ভাত দিতে পারবে না ছেলের মুখে, তখন কি এ অভাবের কথা গোপন থাক্‌বে ছেলের কাছে? ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যখন সে 'ভাত ভাত' করে চীৎকার করবে, তখন মা হয়ে কি জবাব দেবে সে? জবাব না পেয়ে সেকি তখন বুঝবে না যে, তার মা অপদার্থ,

খেতে দিতে পারে না ? জয়গুন ভাবে এসব কথা। এই ভেবে আরো ব্যথিত হয় যে, পেট ভরে খেতে দিতে না পারলে কাসুর কাছে তার বুক-ভরা স্নেহের কোন দামই আর থাকবে না। ছেলের আস্থা থাকবে না মা-র ওপর। মা-র স্নেহের ছায়ায় আসবার জন্য একদিন সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এবার ক্ষুধার তাড়নায় করিমবক্শের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠ্বে আবার।

সন্ধ্যার পর তিনপো চাল গামছায় বেঁধে হাসু বাড়ী আসে।

জয়গুন চোখ টিপে হাসুকে জিজ্ঞেস করে—মাছ কই, হাসু ? তোরে না কইছিলাম ইল্শা মাছ আন্তে ?

হাসু কথার ধরণ বুঝতে পেরে বলে—ইলশা কাতলা কোন মাছই পাইলাম না বাজারে। মাছ মোডে নাই।

দু'দিনের না-খাওয়া জয়গুনের বুকের ভেতর ধড়ফড় করে। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, যেন নাড়ি-ভুঁড়িগুলোও হজম হয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে। গামছায় বাঁধা চাল দেখে তার ক্ষুধা আরো বেড়ে যায়।

জয়গুন সমস্তটা চাল নিয়ে হাঁড়ি বসায় আজ। ভোরের জন্য রেখে দেয় না কিছুই। এই বেলা খেয়ে যদি ভাত বাঁচে, তবে ছেলে-মেয়েরা পান্তা ভাত খাবে ভোরে। কিন্তু সে আশা কম। তার মনে হয়, একাই সে তিনপো চালের ভাত খেতে পারবে এখন।

কচুর লতির চচ্চড়ি ও ডাঁটা শাক দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খায় সকলে। অনাহারে শুকনো বুকে ভাত ঠেকে জয়গুনের, বারবার পানি খেয়ে সে বুক ভিজিয়ে নেয়।

জয়গুন বলে হাসুকে—কি চাউল রে ! ফেন্ডা যে ঘাডের পানির মতন। আবার চুকা। দেইখ্যা আন্তে পারস না ?

—চাউলই পাওয়া যায় না বাজারে, তার আবার দেইখ্যা আনমু।

কত কষ্টে এই চাউল যোগাড় করলাম। বারো ছটাক বারো আনা। কাইল বাজারে ঢোল দিছিল ম্যাজিষ্টর সাব—নয় আনার বেশী এক সেরের দাম নিলে জরিমানা অইব। আইজ এইএর লেইগ্যা বাজারে চাউল নাই। মহাজনরা গোলায় গুজাইয়া থুইছে চাউল।

খাওয়ার শেষে হাঁড়িতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে সকাল সকাল। দু'দিনের অনাহারের পর ভাত খেয়ে জয়গুন আরো শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আজ তার শরীর ঝিম ঝিম করে। চোখ দিয়ে পানি ঝরে শুধু শুধু।

জয়গুন বসে বসেই এশার নামায শেষ করে। প্রতিদিনের মত তস্‌বীহ্ নিয়ে জপ্‌তে আরম্ভ করে। কিন্তু সকল কাজের মধ্যে ঐ এক চিন্তা—কাল রাত পোহালে ছেলে-মেয়ের মুখে কী দেবে? হাসু কী খেয়ে কাজে যাবে? কাসুর কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু নেই।

জয়গুনের উত্তরে চাল কিন্‌তে যাওয়ার সাথী লালুর মা দুইদিন এসেছিল। অনেক সাধাসাধি করেছিল ফতুল্লার ধানকলে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু জয়গুন তওবার কথা ভোলেনি। হাতে পায়ে যে শিকল সে পরেছিল সেদিন, তা খুল্‌বার সাহস তার নেই। শক্তি সে পায় না। নিতান্ত অসহায়-ভাবে সে লালুর মা-র প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ লালুর মা-র বলা কয়েকটি কথা বারবার তার মনে আসে। সে বলেছিল—না খাইয়া জানেরে কষ্ট দিলে খোদা ব্যাজার অয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব: তোর আত-পাও দিছিলাম কিসের লেইগ্যা? আত দিছিলাম খাট্‌বার লেইগ্যা, পাও দিছিলাম বিদ্যাশে গিয়া ট্যাকা রুজি করনের লেইগ্যা।

লালুর মা কথায় কথায় গ্রাম্য গীতের কয়েকটা লাইনও গেয়ে উঠেছিল সেদিন:

আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর‍্যা দোর।

কথাগুলি আজ তার নতুন অর্থ, নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে জয়গুনের চিন্তাকে নাড়া দেয়। লালুর মা-র প্রস্তাবকে সে বারবার বিবেচনা করে দেখে। ধান-কলের কাজ এমন কিছু নয়। ধান ঘাটা, ধান রোদে দেওয়া, চাল ঝাড়া—এই সব কাজ। রোজ পাঁচ সিকা করে পাওয়া যায়। তা ছাড়া খুদ-কুঁড়াও পাওয়া যায় চেয়ে-চিন্তে।

মনের দুই বিরোধী চিন্তার সংঘর্ষের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

মশার কামড় খেয়ে মায়মুন হাত-পা নাড়ছে। জয়গুন তাকায় ঐ দিকে। হাসু বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। সারাদিন খেটে তার আর হুঁস নেই। মশার কামড়েও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। কাসু তার মিঞা ভাইর গলা ধরে তার গায়ের উপর একখানা পা চড়িয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কুপীর অস্পষ্ট আলোকে ছেলেমেয়েদের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তাদের কচি মুখ জয়গুনকে তার পথের সন্ধান বাতলে দেয়, তওবার কথা সে ভুলে যায়। লালুর মার প্রস্তাব মাথায় নিয়ে কাল যাবে সে ধান-কলে কাজ করতে। হাতে-পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধার অন্ন যার ঘরে নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নেভাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।

জয়গুন সুঁই-সুতা নিয়ে কাপড় সেলাই করতে বসে। কাপড়টা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এ কাপড় নিয়ে বেরুবার উপায় নেই। হাসুর গামছা বুকে জড়িয়ে গায়ের আঁচলটা আগে সেলাই করে। সেটা শেষ হলে বাকী আঁচলটা সেলাই করে তারপর।

ভোর হয়। ঘুম থেকে জয়গুন ওঠে নতুন প্রাণ নতুন উদ্যম নিয়ে।

শফীর মা-র কাছ থেকে চাল ধার করে রান্না হয়। ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে জয়গুন বেরিয়ে পড়ে।

ধানখেতের আল ধরে পথ চলে জয়গুন। হাঁটু-সমান উঁচু ধানগাছে ভরা মাঠ। যেন সবুজ দরিয়া। ঝিরঝিরে বাতাস ঢেউএর নাচন তুলে এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। দূর প্রসারী মাঠের দিকে তাকিয়ে জয়গুনের চোখ জুড়ায়।

খেতের কাজে ব্যস্ত চাষীরা তাকায় জয়গুনের দিকে। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। গদু প্রধান তার খেত তদারক করছিল। সকলের অলক্ষে সে মাথা নাড়ে আর বলে—তোরে শাসন করতে পারতাম না! আমার নাম গদু পরধান। এট্টু সবুর কর্।

উনিশ

সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত ক্ষেপেছে।

রাত্রে জয়গুনের ঘরের বেড়া ও চালের ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে। হাসু, কাসু ও মায়মুন চীৎকার করে ওঠে, শেষে গলা দিয়ে চীৎকারও বের হয় না। ভয়ে তারা মা-কে জড়িয়ে ধরে।

ওদিকে শফীর মা-র চীৎকার শোনা যায়।

পরের দিন ভোরে সে বলে—হেস্থম কইছিলাম পাহাড়া বদলাইতে। এখন দ্যা—খ্ কী দশা অয়। গাছগুলা কাট্‌তে মানা করছিলাম। কোন্ গাছে কি আছিল কে জানে? ওগ বাসা ভাইঙ্গা দেওনে রাগ অইছে।

পরের রাত্রেও এমনি ঢিল পড়ে। গ্রামে এই নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর কাছ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

গ্রামের বুড়ো সোনাই কাজী বলে—সূর্যু-দীগল বাড়ীর ভূত ক্ষেপেছে, আর উফায় নাই। সূর্যু-দীগল বাড়ীতে মানুষ উজাইতে পারে না, বুড়া বুড়ীর কাছে হুন্‌ছি। সূর্যু-দীগল হাটেরও উন্নতি অয় না। আমার চউখেই দ্যাখলাম, জলধর কুণ্ডু কুণ্ডের চরে হাট মিলানের লেইগ্যা কত ট্যাকা খরচ করল। কত হরিলুট দিল। ব্যাপারীগ মিডাই খাওয়াইল, নট্ট কোম্পানীর যাত্রা-গানেও দুই এক হাজার ট্যাকা খরচ করছিল। কিন্তু কই? হাট আর মিলাইতে পারল না।

থুত্থুরে বুড়ী হনুফা বিবি বলে—আমার মামু একবার সূর্যু-দীগল

মৌ-পোকের বাসা ভাঙছিল। আমার মনে আছে। গাছের তন নামতে না নামতে আঁড়ির তলা ভাইঙ্গা মধু পইড়্যা গেল। কী তেজ! বাপ্পুসুরে!

জয়গুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রাত্রে শফীর মার ঘরে আশ্রয় নেয়। ছেলে-মেয়েদের বুকে নিয়ে সারারাত 'আল্লা আল্লা' করে।

* * *

অমাবস্যার রাত। করিমবক্শ গালে হাত দিয়ে কুপীর সামনে বসে ভাবছে। তার মনের চোখে ভাসে ঃ জয়গুনের ঘরে ঢিল পড়ছে দাড়ুম-দুড়ুম। তার বুকে কাসু ও মায়মুন ভয়ে মিইয়ে গেছে। হাসু পাশে বসে কাঁপছে চোখ বন্ধ করে। জয়গুন আর একা এদের সামলাতে পারছে না। করিমবক্শের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। তার চোখের অব্যক্ত ভাষায় সে যেন সাহায্য চাইছে তার কাছে।

করিমবকশ ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তাকের ওপর থেকে চারটে গজাল নিয়ে গামছায় বাঁধে। জোবেদালী ফকিরের নির্দেশমত আজ এই অমাবস্যার দুপুর রাতে সূর্য-দীঘল বাড়ীর চার কোণে মন্ত্রসিদ্ধ গজাল কয়টি পুঁতে আস্তে হবে তাকে।

সূর্য-দীঘল বাড়ী ঠিক-ঠাক করে জোবেদালী ফকির সেই যে একটা পেতলের কলসী দাবী করেছিল, আজ পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি সে কলসী। বছর বছর পাহাড়া বদলাবার কথাও সে বলেছিল। তাতেও কান দেয়নি জয়গুন ও শফীর মা। এজন্য গোস্বা হয়ে সে করিমবক্শকে জানিয়েছিল ঃ 'এইবার দেখুক মজাখান্। সাত দিনের মধ্যে বেবাক মিস্মার অইয়া যাইব।' করিমবক্শ একটা

পেতলের কলসী কিনে দিয়ে এবং অনেক হাতে-পায়ে ধরে জোবেদালী ফকিরের রাগ মাটি করেছে। ফকির গজাল কয়টায় ফুঁ ফাঁ দিয়ে তুক-তাক করে করিমবক্শের হাতে দিয়ে বলে—পরশু আমাবইস্যা। রাইত দুফরের পর——। চাইর কোণে চাইড্ডা—।

—আমার ডর করে যে। একলা যাইতে সাবাসে কুলায় না। করিমবক্শ বলে।

—ডর করে! কও কী!

একটু চিন্তা করে ফকির বলে—আইচ্ছা, হেই দাওয়াইও আছে। করিমবক্শের কাঁধে দুই হাত রেখে ফকির টানা সুরে মন্ত্র পড়ে—

খাটো কাপড় উলট বেশে
বাণ মারলাম হেসে হেসে,
সেই বাণে মেদিনী কাঁপে
জল কাঁপে থল কাঁপে
চান কাঁপে তারা কাঁপে
পাতালের বাসুকী কাঁপে,
আগে ভাগে ভূত-পেরেত
জিন ভাগে পাছে,
কালা বাণে ভূত মারলাম
পেত্নী বান্‌লাম কেশে।

মন্ত্র পড়ে করিমবক্শের বুকে ও চোখে সাতবার ফুঁ দিয়ে ফকির এবার বলে—ডরের মাজা ভাইঙ্গা দিছি। যাও এইবার, আর ডর নাই। পরশু রাইত দুফরের পর, মনে থাকে যেন্। চাইর কোণায় চাইড্যা—

চারটি গজাল—বাড়ীর চার পাহারাদার। ঠিকে-ঠাকে বসিয়ে আসৃতে পারলে ভূত-পেত্নীর দৌরাত্ম আর থাকবে না।

কুপী নিবিয়ে করিমবকৃশ লাফ দিয়ে ঘর হতে বেরোয়। সে পা ফেলে জোরে, আরো জোরে। কালো রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন ভয় পেয়ে তার চলার পথ ছেড়ে দেয়।

ঈশান ও বায়ু কোণে দুইটি গজাল পুঁতে সে পশ্চিমদিকে চলে আসে। ঘন অন্ধকার। তার মাঝেও দৃষ্টি চলে করিমবকৃশের। তিনটা ছায়ামূর্তি! ভয়ে তার গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছের তলায় সে থম্‌কে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে মাটিতে।

* * * *

ছায়ামূর্তিগুলি ঢিল ছুঁড়ছে আর তারই দিকে সরে সরে আসৃছে। করিমবকৃশ একটা শব্দহীন চীৎকার করে ওঠে। বার কয়েক ঢিপ ঢিপ করে হৃদযন্ত্রটা যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। একটা মূর্তি আরো কাছে সরে আসে তার। করিমবকৃশের গায়ে ধাক্কা লাগে। এবার করিমবকৃশ চিন্‌তে ভুল করে না। হৃদযন্ত্রটা আবার বার দুই ঢিপ ঢিপ করে চালু হয়ে যায়। হঠাৎ ঘাম দিয়ে তার ভয়ও কেটে যায়। সে দাঁড়ায়। পাশ থেকে খপ্‌ করে ছায়ামূর্তির একটার হাত চেপে ধরে—গদু পরধান! তোমার এই কাম!! তুমি না………… !!!

* *

সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছের তলায় করিমবকৃশের মৃতদেহ টান

হয়ে পড়ে আছে। আশ-পাশ গ্রামের লোক ছুটে আসে দেখ্‌তে। মৃতের শরীরে কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। সকলেই একমত—সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত গলা টিপে মেরেছে।

* * *

যে হিম্মত বুকে বেঁধে জয়গুন এতদিন সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ছিল, তা আজ খান্‌খান্ হয়ে যায় এ ঘটনার পরে।

আজ বারবার করিমবক্‌শের কথাই মনে হয় জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালবাসেনি। কারো ভালবাসা পায়ওনি সে।

শফীর মা আগে আগে গাঠ্‌রি বোচ্‌কা বাঁধে। জয়গুন জিজ্ঞেস করে—বাড়ী ছাইড়্যা কই যাইবা?

—আগেত সোনার মাণিকগ লইয়া বাইর অও। খোদার এত বড় দুইন্যায় কি আর এট্টু জায়গা পাইতাম না আমরা?

ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে জয়গুন ও শফীর মা বেরিয়ে পড়ে। মনে তাদের ভরসা—খোদার বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই।

চল্‌তে চল্‌তে বারবার জয়গুন পিছন ফিরে তাকায়। সূর্য-দীঘল বাড়ী! মানুষ বাস করতে পারে না এ বাড়ীতে।

দু'খানা ঝুপড়ি। রোদ-বৃষ্টি ও অন্ধকারে মাথা গুঁজবার নীড়। দিনের শেষে কাজের শেষে মানুষ, পশু-পক্ষী এই নীড়ে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ঐ উঁচু তালগাছ। অনেক কালের অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী এটা।

তারা এগিয়ে চলে।

বহুদূর হেঁটে শ্রান্ত পাগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তারা গাছতলায় বসে। উঁচু তালগাছটা এতদূর থেকেও যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকছে।

আবার তারা এগিয়ে চলে।.........

সমাপ্ত